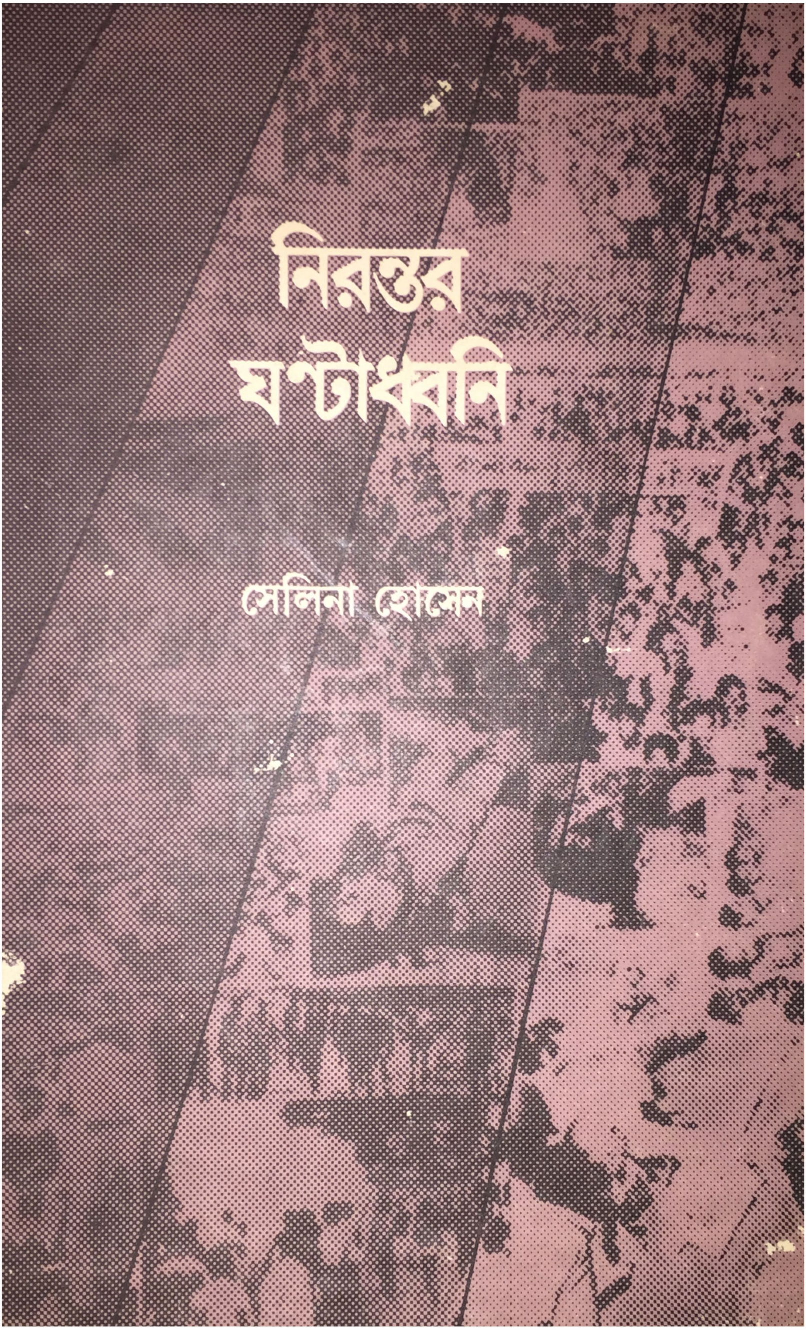

নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি

সেলিনা হোসেন

নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি

সেলিনা হোসেন

আহমদ পাবলিশিং হাউস

সর্বস্বত্ব ঃ
লাজিনা মুনা

প্রকাশক ঃ
মহিউদ্দীন আহমদ
আহমদ পাবলিশিং হাউস
৭, জিন্দাবাহার প্রথম লেন
ঢাকা-১

প্রথম প্রকাশ ঃ
১ বৈশাখ ১৩৯৪
১৫ এপ্রিল ১৯৮৭

মুদ্রক ঃ
মেছবাহ উদ্দিন আহমদ
আহমদ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৭, জিন্দাবাহার প্রথম লেন
ঢাকা-১

প্রচ্ছদ ঃ সমর মজুমদার

মূল্য—চুয়ান্ন টাকা মাত্র

উৎসর্গ

আফজল হোসেন

প্রেম যার নিত্য আনন্দ

লেখকের অন্যান্য বই

গল্প

উৎস থেকে নিরন্তর

খোল করতাল

পরজন্ম

উপন্যাস

জলোচ্ছ্বাস

হাঙর নদী গ্রেনেড (২য় সংস্করণ)

মগ্ন চৈতন্যে শিস ,,

যাপিত জীবন ,,

নীল ময়ূরের যৌবন

পদশব্দ

চাঁদ বেনে

পোকামাকড়ের ঘরবসতি

রচনাকাল

জানুয়ারি ১৬ থেকে ডিসেম্বর ২১, ১৯৮৬

বুকের নিচে বালিশ চেপে উপুড় হয়ে শুয়ে নিজের নামটা বার বার লিখছে আর কাটছে সোমেন। ওর প্রিয় অভ্যেস। কবে থেকে যে এ অভ্যেসটা নিজের মধ্যে গড়ে উঠেছে টের পায় নি। কৈশোরে না যৌবনের শুরুতে তা বলতে পারছে না। খুব অস্পষ্টভাবে মনে পড়ে একবার নদীর ধারে বালুর মধ্যে নিজের নাম লিখে মুছে ফেলেছিলো। সেটা ছিলো খেলা। এখন আর খেলা নয়, এখন অভ্যেস। নিজের বুক হালকা করার কৌশল। মনে মনে হাসে ও। বেঁচে থাকার জন্যে কত রকমে কতভাবে যে আয়োজন করতে হয়। আজ মন খারাপ। তাই খাতার পৃষ্ঠা ভরে যাচ্ছে আঁকিবুঁকিতে। মন খারাপ থাকলে এমনই করে, ঠিক আক্রোশে নয়, অসহায় বিষণ্ণতায় নিষ্পেষিত হয় বলে। তিন অক্ষরের নামটাকে উল্টেপাল্টে ভেঙেচুরে বিভিন্নভাবে লিখতে ভালো লাগছে। কখনো সেই নামের অক্ষর ধরে ফুল বানাচ্ছে, কখনো পাখি, নয়তো মানুষের মুখ। বাইরে টিপটিপ বৃষ্টি, বাতাসের জোর দাপট। কদিন ধরেই মেঘলা যাচ্ছিলো। আজ নেমেছে, তেমন জোরালো নয়। এক সময় কলমটা বন্ধ করে বালিশে মুখ গুঁজে দেয়, নিজের নামটা ওর ভীষণ প্রিয়, সোমেন চন্দ, মা ডাকতেন সোম। বুকের ভেতর থেকে কেমন একটা শব্দ আসছে। শৈশবে শোনা মায়ের কণ্ঠ, যা এখন কোথাও নেই, অথচ আছে, বুক-জুড়ে হাহাকারের ধ্বনি হয়ে। চোখের জলে বালিশ ভিজে যায়। মনে হয় বুকে কষ্ট হচ্ছে, উঠে পা জড়ো করে বসে, হাঁটুতে মাথা রাখে। কিছুতেই অস্বস্তি কাটে না। ব্যথা বাড়লে নিজেকে ঠিক রাখা মুশকিল হয়। আর এজন্যেই পড়াশোনার পাট চুকিয়ে দিতে হলো। মিটফোর্ড মেডিক্যাল স্কুলে আর কোনোদিন যাবে না ও। আজই শেষ দিন।

ব্যথা কি সেজন্য? নিজেকে প্রশ্ন করে। না কি আসলেই অসুস্থতা? উত্তর দিতে পারে না। হয়তো দুটোই। শারীরিক এবং মানসিক কষ্ট দুটো মিলেই আজ একটা হয়েছে। কখনো দুটোই এক হয়

না। আলাদাই থাকে। আজ পালাবদলের সময়, তাই দুয়ের এমন মহাসম্মিলন। নিজেকে বেশ অন্যরকম লাগে। কিছুটা নতুন, কিছুটা অচেনা। মেডিক্যাল কলেজ ছেড়ে এসে জীবনের ভিন্ন রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে সোমেন বার বার নিজের দিকেই ফিরে তাকায়। এই মুহূর্তে নিজেকে চেনা সবচেয়ে বেশি জরুরি। কি করবে তার একটা সঠিক সিদ্ধান্ত তো নিতে হবে। ঘরে আলো-আঁধারি। উঠে হারিকেন জ্বালায়। জানালার বাইরে একটি পেয়ারা গাছ। ডালপালার জন্যে ঘরে আলো কম আসে। ইচ্ছে করলে ডালগুলো কেটে দিলেই হয়, কিন্তু ও কাটে না। বিছানায় শুয়ে জানালার গরাদের ফাঁকে ডাল দেখতে ওর ভালো লাগে, মনে হয় ছবির মতো। কারো আঁকা ছবি, বড় বেশি অবিন্যস্ত অথচ কোথায় যেন বিন্যাস আছে। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলে অনুধাবন করা যায়, নইলে দৃষ্টির আড়ালে পড়ে। কোনো কিছু দৃষ্টির আড়ালে পড়া ওর একদম পছন্দ নয়। হারিকেনের সলতে উস্কে দিয়ে চৌকির ওপর রাখে। বাতাসের ঝাপটায় শিখা দপ্‌দপিয়ে উঠলে জানালা বন্ধ করে। তখুনি হুইসেল বাজিয়ে ট্রেন যায়। শব্দটা অন্য দিন ভালো লাগে, কান পেতে শোনে। মনে হয় ছেলেবেলায় দুষ্টুমি করে পালিয়ে যাবার সময় মা-র পিছু ডাকের মতো। আজ ওর মাথা ভার লাগে। শরীরও খারাপ লাগছে। কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে। রাতে আর খাওয়া হবে না। বৃষ্টির কারণে হয়তো ভূষণের মা খাবার পাঠায় নি। বৃষ্টি হলেই কষ্ট, কাঠ-কয়লার চুলো জ্বলতেই চায় না। ধোঁয়ায় চোখ লাল হয়ে যায় ভূষণের মা-র। দৃশ্যটা চোখের সামনে দেখতে পায় সোমেন। ওর এমনই হয়। কোনো কিছু ভাবলে সেটা বড় বেশি কাছে এসে যায় যেন হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারে। বুকের ব্যথা বাড়ছে। কেন যে ব্যথাটা হয় বোঝে না। ঠিকমতো চিকিৎসাও হলো না। ভালো যে হবে সে ভরসাও নেই। কেননা চিকিৎসা করানোর তেমন সঙ্গতি বাবার নেই। চিকিৎসার জন্যে কলকাতায় যেতে হবে। ওখানে তেমন আত্মীয় নেই যে সাত দিন থেকে ডাক্তার দেখিয়ে আসতে পারে। তাই শারীরিক কষ্ট নিত্যসঙ্গী। এটা ও ধরেই নিয়েছে। কষ্ট বেশি হলে দম আটকে পড়ে থাকে। হৈ-চৈ করে না, শব্দও না। ভালো রেজাল্ট নিয়ে ম্যাট্রিক পাশ করে ভেবেছিলো ডাক্তার হবে। ঐ আশা নিয়ে মিটফোর্ড স্কুলে ভর্তি হয়েছিলো। কিন্তু এক বছরের বেশি চালাতে পারলো না। অর্থ-কষ্টের সঙ্গে সঙ্গে শরীরও বেঁকে দাঁড়ালো। বেশি খাটুনি সয় না, তাই ছেড়েই দিতে হলো। সোমেনের হাসি পায়, পরিকল্পনা মাফিক

জীবনটা এগুলে তো সমস্যাই থাকতো না। সমস্যা হয় বলেই তো প্রতিকারের জন্যে এত প্রচেষ্টা।

চৌকির নিচ থেকে খুট্‌খুট শব্দ আসছে। ধেড়ে ইঁদুরটা এসে ঢুকেছে। সারাদিন যেখানেই থাক না কেন সন্ধ্যা হলেই ওটা ঘরে এসে ঢুকবে। গত বিশ দিন ধরে এমন হচ্ছে। ও মারার কথা ভাবে নি, ওটাকে দিয়ে একটা গল্প লিখবে ভাবছে। গল্পের ছক গুছিয়ে এনেছে, কিন্তু মনমতো হচ্ছে না বলে এগুতে পারছে না। গতকাল ভূষণ এই নিয়ে ঠাট্টা করেছে, ইঁদুরটা তো তোকে ভালোই দখল করেছে রে?

সোমেন মৃদু হাসে।

দখল করে নি। সুতো ছেড়ে রেখেছি কেবল, একসময় ঠিকই টেনে তুলবো।

কি জানি বাপু, বুঝি না তোকে, তুইতো আবার লিখিয়ে। কি করে যে বানিয়ে বানিয়ে এমন হাবিজাবি লিখিস তা আমার মাথায়ই ঢোকে না। তবে পড়তে খুব ভালোলাগে। কখনো অবাক হয়ে ভাবি, আমার মনের কথা তুই কি করে টের পেলি? কেমন করে পারিস রে সোমেন?

সোমেন ভূষণের পিঠ চাপড়ে দেয়।

তুই আমার খুব ভালো বন্ধু রে।

ভূষণ বোকার মতো হাসে। সোমেনের অনেক কথাই ও বোঝে না। কিন্তু সোমেনের অনুগত থাকতে ভীষণ ভালোবাসে। একই গ্রামের ছেলে ওরা। দুজনে একসঙ্গে স্কুলে পড়েছে। ভূষণ ম্যাট্রিক পাশ করে আর পড়ে নি। ও এখন রেলের ড্রাইভার। সেই সূত্রে সোমেন এখানে থাকে। এই ছোট্ট কুঠুরি ভূষণই জোগাড় করেছে। খাওয়ার ব্যবস্থা এদের সঙ্গে। কখনো গিয়ে খেয়ে আসে, কখনো পাঠিয়ে দেয়। ভূষণের বাবা নেই, নয় ভাইবোনের সংসারের দায়িত্ব ওর ওপর। তবু হাসি-খুশি প্রাণখোলা মানুষ ও। অভাবকে দুহাতে বেড় দিয়ে রেখেছে। সোমেন মনে মনে ভাবে, ভূষণের প্রাণশক্তি সবার মধ্যে থাকলে কখনোই হেরে যাবার কথা ভাবতো না। কিন্তু তা হয় না বলেই সমস্যা কখনো পায়ের বেড়ি হয়ে যায়। রেল শ্রমিকদের মধ্যে ইউনিয়ন করতে এসে এই উপলব্ধি সোমেনকে আক্রান্ত করে রাখে।

ইঁদুর এখন চৌকির নিচ থেকে বেরিয়ে মেঝেতে ঘুরঘুর করছে। সোমেন হাসে, ওর সাহস বেড়েছে। একদিন ঘরে আলো থাকলে ওটা কখনো সামনে আসে নি। ও কি ভেবেছে ঘরে কেউ নেই? না কি ওকে

অগ্রাহ্য করছে? জ্যোতির্ময়দা বলে যারা আড়ালে বসে কাটে তারা অমন আস্তে আস্তে শক্তি সঞ্চয় করে। সোমেন ভেবে দেখলো ইঁদুরটার এখন তেমন সময়। আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হবে ও জিতে যাচ্ছে, ওর সামনে বাধা নেই, পথ পরিষ্কার। কিন্তু ঐ ভুলটা ওদের থেকেই যায়। এগুনোর সীমা থাকে। ও যত এগুবে ওর মরণের পথ ততো পরিষ্কার হবে। ও একদৃষ্টে ওটার ঘোরাফেরা দেখে। হারিকেনের সলতে উস্কে দিলে থমকে দাঁড়ায়, তারপর ধীরে-সুস্থে মেঝেয় গাদা করে রাখা পত্রিকার স্তূপের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। তখুনি গল্পটা সোমেনের মগজে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ও বালিশের নিচ থেকে খাতাটা বের করে উপুড় হয়ে লিখতে শুরু করে। গত সপ্তাহে 'বনস্পতি' গল্পটা শেষ করেছে। বন্ধুরা ভালো বলেছে, বিশেষ করে রণেশ তো মহাখুশি। ওটা পড়ার পর থেকেই ওর পিছে লেগে আছে আর একটা নতুন গল্প শুরু করবার জন্যে। ও বলে, এভাবেই আমাদের গণমুখী সাহিত্যের ধারা তৈরি করতে হবে। সোমেনের কলম থেমে যায়, একটা প্যারা লিখে আর এগুতে পারছে না। ও এভাবেই লেখে। অল্প অল্প করে এগোয়। একটানা লিখে শেষ করতে পারে না। কলমটা বন্ধ করলে রণেশের চেহারা ভেসে ওঠে। প্রিয় মানুষের চেহারা বড় আনন্দদায়ক। মনে মনে বলে, রণেশ দাশগুপ্ত, আমার প্রিয় বন্ধু, তুই ঠিকই বলেছিস। এই মুহূর্তে তুই কাছে থাকলে আমি তোকে 'ইঁদুর' গল্পের পরিকল্পনাটা শুনিয়ে দিতাম। কাছে থাকলে আমার বড় উপকার হতো রে। ওর হঠাৎ মনে হয় বুকের ব্যথাটা আর নেই। এখন ওর ভালো লাগছে, হারিকেনের উজ্জ্বল আলো গ্রামের জ্যোৎস্না রাতের মতো মোহনীয়, মেঝেতে ইঁদুরটা নেই। বাইরে বৃষ্টির পতন নিঃশেষ। যেন চারদিকে ভীষণ সুবাতাস বইছে। ও চৌকি থেকে নেমে জানালা খুলে দেয়। এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস বুক ভরে শ্বাস নিলে মনে হয় জন্ম-মুহূর্তটি পর্যন্ত স্নিগ্ধ হয়ে গেলো। শুনতে পায় মা-র অনুচ্চ কণ্ঠ, সোমু, সোম বাবা। ও জানালার শিকে মাথা রেখে পেয়ারা গাছের পাতা ছুঁয়ে দেখে। বৃষ্টি-ধোঁয়া ভেজা পাতা স্নিগ্ধ, সুশীতল। হাত বাড়িয়ে গাছের পাতার ফোঁটা পানি টুপটুপিয়ে ঝরিয়ে দেয়। এভাবেই বুঝি শৈশবের মজার খেলা যৌবনে ফিরে আসে, যৌবনেরটা বার্ধক্যে। জীবনের এই ছোটখাটো পুনরাবৃত্তি একঘেঁয়ে রুটিন-বাঁধা সময়ের আশ্চর্য ব্যতিক্রম!

জ্যোতির্ময়দা এলেই বলবেন, এই গাছটা তোর একটা স্থায়ী আনন্দ। মানুষটা এখন যক্ষ্মার সঙ্গে লড়াই করছে। গত বছর জেলখানা থেকে

বেরিয়েছেন যক্ষ্মা নিয়ে। অল্প বয়সে বিপ্লবী দলে ঢুকেছিলেন। ১৯৩২-এ ঢাকায় ট্রেন ডাকাতি রাজনৈতিক মামলায় অভিযুক্ত হয়ে জেল খাটলেন, টগবগে তরুণ, চোখে দেশমাতৃকার মুক্তির স্বপ্ন। উজ্জ্বল কান্তিমান চেহারা, দেখলে ভালোবাসতে ইচ্ছে করে। এখন দারুণ যক্ষ্মায় চক্ষু কোটরগত, ভগ্নস্বাস্থ্য। ছয় বছরে জেল জীবনে প্রিয়তমা হলো রাজরোগ, এখন আর কিছুতেই সঙ্গ ছাড়ে না। তবু তো হতাশ হন নি তিনি। ঢাকার রেল শ্রমিক ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতাদের একজন। সব সময় বলেন, হাতাশা বুর্জোয়াদের বিলাস, সর্বহারাদের আবার হতাশা কি? ঐ ফ্রাস্ট্রেশন শব্দটা শুনলে আমার পিত্তি জ্বলে ওঠে। বুঝলি? সোমেন হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। হা-হা করে হাসে জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত। তাঁর কাছে থেকেই প্রথম বার্টোল্ড ব্রেশ্টের নাম শোনে সোমেন। তিনি ব্রেশ্টের ওপর নিবন্ধ লিখেছেন, একটা নাটক অনুবাদের কথাও ভাবছেন। এই ভালো-মানুষটির কষ্টে ওর দুঃখ হয়। হতাশ হতে ও চায় না, কিন্তু কখনো বুকের তল হিম হয়ে যায়। বড় সাময়িক সে অনুভূতি, তবু ভয়ানক তীব্র সে দংশন।

ও নিজেও তো চায় হাতভরা কাজ, পেটভরা ভাত, মনভরা ফুর্তি। কিন্তু বিরুদ্ধ পরিবেশের সঙ্গে কুলিয়ে উঠতে পারে না। তখন খচে যায় মেজাজ। ও বোঝে সময় মতো শত্রুর গায়ে লাথি দিতে না পারলে, শত্রু ওর গলায় ফাঁস দেবে। ওর নিষ্ক্রিয়তাকে ক্ষমা করে কাছে টানবে না। লাথি দেয়াই তার ধর্ম। লাথি দিয়েই দাবিয়ে রাখতে চায়। শ্রমিকদের মধ্যে এই চেতনা ও ছড়িয়ে দিচ্ছে। ওরা এখন মনোযোগ দিয়ে ওর কথা শোনে। ওরা জানতে চায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কথা। এখন তিরিশের দশকের পৃথিবীর দরিদ্র দেশগুলো এই শক্তির দাপটে ম্রিয়মাণ।

দরজায় টুক্‌টুক শব্দ হয়। ভূষণ এসেছে। গামছায় বাঁধা এক বাটি ভাত। সোমেন দরজা খোলে। ভূষণ লাজুক হাসি হেসে বলে, মা-র রাঁধতে দেরি হয়ে গেলো।

আয় ভেতরে আয়। তোর যা ভণিতা। একদিন না বলেছি আমার সঙ্গে ভণিতা করবি না।

ভূষণ চৌকির ওপর বসে। একটা প্যাকিং-এর বাক্স উল্টো করে টেবিলের কাজ সারে সোমেন। ভাতের বাটি, গ্লাশ, চামচ, ওষুধের শিশি, নিমের দাঁতন এইসব টুকিটাকি জিনিস রাখে। এককোণে দড়িতে ঝোলানো কয়েকটা কাপড়। খাটের নিচে টিনের তোরঙ্গ। আপাতত

খালি, বাড়ি যাবার সময় কাজে লাগে। এ ছাড়া আছে ঘর-জুড়ে পত্র-পত্রিকা, কিছু বই, পার্টির পোস্টার, লিফলেট এইসব। লেখাপড়ার জন্যে ওর চৌকিই সম্বল। লেখার সময় বুকের নিচে বালিশ দিয়ে উপুড় হয়ে লেখে। পড়ার সময় মাথার নিচে বালিশ দিয়ে চিৎ হয়ে পড়ে। প্রথম দিকে বুকে ব্যথা হতো। এখন অভ্যেস হয়ে গেছে। খারাপ লাগে না। ভূষণ উসখুস করে বলে,

ভাত খেয়ে নে, বাটিটা নিয়ে যাই।

তুই খেয়েছিস ?

না গিয়ে খাবো। রাত হয়ে গেছে তাই তাড়াতাড়ি চলে এলাম।

বাইরে যা অন্ধকার !

তোর ভয় করে নি ?

একটু একটু যে করছিলোনা তা নয়।

কিসের, ভূতের ?

হ্যাঁ, তাও বলতে পারিস। গা ছমছম করছিলো আমার। ঠিক তেমন লাগছিলো ছোটবেলায় তেতুঁলতলা দিয়ে যেতে যেমন লাগতো।

দুজনেই হো-হো করে হেসে ওঠে। স্টেশনে একটা ট্রেন এসে ঢোকে। সেইসঙ্গে চাপা পড়ে যায় দুজনের হাসি। সোমেনের ঘর থেকে স্টেশন অল্প একটু পথ। ফুলবাড়িয়া নামটা ওর ভালোলাগে, এলাকাটা নোংরা, কখনো বাতাসে কয়লার কুচি উড়ে এসে চোখে লাগে। তখন চোখ লাল হয়ে যায়, জ্বালা করে, পানি পড়ে। নইলে সোমেনের খারাপ লাগে না। মানুষের আসা-যাওয়া ও বসে থেকে দেখে। রেলের সমান্তরাল পাতের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মাথায় এলোমেলো চিন্তা ঘনিয়ে ওঠে এবং আশ্চর্যজনকভাবে সেইসব চিন্তা পরমুহূর্তে ঐ পাতের মতো সমান হয়ে যায়। মগজ তীক্ষ্ণধী হয়ে ওকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পেঁছে দেয়। ও স্থির সেই লক্ষ্য ধরে এগোতে চায়। ওর জন্যে আর কোনো পথের বাঁক নেই। ইউনিয়নের কাজ ওকে বাড়তি শক্তি জোগায়। বোঝে মানুষকে একটা নির্দিষ্ট আলোর রেখায় আনতে না পারলে ওর জীবন তো বৃথা।

আজ খেতে তোর কষ্ট হবে। ঘরে কিছু ছিলো না রে।

ভূষণের অপরাধী কণ্ঠ ওকে রাগিয়ে দেয়।

বাজে কথা বলবি তো মেরে তোর মাথা ফাটিয়ে ফেলবো।

ঠিক আছে ক্ষমা করে দে।

ভূষণ জোড় হাত করে বসে থাকে। সোমেন ভাতের বাটি খুলে থালায় ভাত ঢেলে নেয় সঙ্গে আলু-ডাটার চচ্চড়ি। লাল চালের ভাত, মোটা। তাড়াহুড়োর কারণে আজ হয়তো ভালো করে সেদ্ধ হয় নি। ভাত একটু নরম না হলে ওর খেতে কষ্ট হয়। তবু নির্বিকার চিবিয়ে যায়। পেটে খিদে, তাই আশেপাশে চাইবার সময় নেই। হঠাৎ বুকটা ছলকে ওঠে। আব্দার করে কোনোকিছু চাইবার মতো কি কেউ ওর আছে? যেখানে জোর চলে, অভিমান চলে? ধুৎ এসব কাঁচা ভাবনা ভেবে লাভ নেই। দ্রুত খাবার চেষ্টা করে। ভূষণ অপেক্ষা করছে। এক গ্লাশ পানি ঢক্‌ঢকিয়ে খাবার সময় শুনতে পায় ভূষণ বলছে,

বীণাদির জন্যে আমার খুব কষ্ট হয় রে সোমেন।

আমারও।

সোমেন গ্লাশের পানি শেষ করতে পারে না। ঠক্ করে গ্লাশটা নামিয়ে রাখে। মন খারাপ হয়ে যায়। শেষের ভাতটুকু আর খাঁওয়া হলো না।

জ্যোতিদা কি ভালো হবে না?

জানি না।

বীণাদি সুত্রাপুরে এক প্রাইমারী স্কুলে চাকরি পেয়েছে।

তাই নাকি? শুনি নি তো।

মাত্র কালকের কথা। আমাকে বলে গেছে। তোকে জানাতে বলেছে। ভালোই হয়েছে। এখন আর বিয়ের জন্যে বীণাদির বাবা চাপ দেবেন না। দরকার হলে বীণাদি হোস্টেলে চলে যাবে।

কিন্তু জ্যোতিদা যে এখন আর বিয়ে করতে চায় না।

দুজনে হঠাৎ চুপ করে যায়। জ্যোতির্ময় যা বলে তা দুজনেই জানে, কিন্তু কেউ কোনো প্রতিকার খুঁজে পায় না। অকস্মাৎ ঘরের বাতাস ভারি হয়ে যায়। চৌকির নিচ থেকে ইঁদুরটা আবার খুটখুট শব্দ শুরু করে। এলোপাথাড়ি সে শব্দে দুজনেরই মনে হয় যেন জ্যোতির্ময়ের কণ্ঠ।

এই ক্ষয়রোগ নিয়ে বিয়ে করে বীণার জীবন আমি নষ্ট করে দিতে পারি না সোমেন। ওকে কত বোঝাই, ও বুঝতেই চায় না। আমার জন্যে অপেক্ষা করতে করতেই বুঝি ওর জীবন ফুরিয়ে যাবে। তোরা ওকে বোঝা সোমেন। এখনো সময় আছে, ও অন্য কোথাও বিয়ে করে ঘর-সংসার পাতুক।

জ্যোতিদা, বীণাদি তো শুধু ঘর-সংসার চায় না, চায় তোমাকে।

আমার সব ফুরিয়েগেছে, আমি আর কি দেবো !

জ্যোতির্ময়ের বিষণ্ণ কণ্ঠ সারা ঘরে হা-হা করে ফেরে।

ট্রেনে ডাকাতির আগে বীণার সঙ্গে আমার ভালোবাসা। জেলে গেলো বছর ছয়, এখন ধরেছে ক্ষয়, প্রাণে আর কত সয় !

জ্যোতির্ময় হাসতে হাসতে ছড়ার সুরে বলে, কিন্তু সব কিছু ছাপিয়ে অশ্রুর ঢেউ গড়ায় ওদের মনে। সোমেন উঠে পড়ে। আরো এক গ্লাশ পানি খায়। তীব্র পিপাসায় বুকটা খাক্ হয়ে আছে। জল পড়লে, পাতা নড়লে শীতল হয়। কিন্তু সে বড় ক্ষণিকের। ইচ্ছে করে দুহাতে সবকিছু ছিঁড়ে ফেলে ছুটে বেরিয়ে যেতে।

সোমেন ?

ভূষণের কণ্ঠ ভেজা। সোমেন অন্য দিকে তাকিয়ে থেকেই উত্তর দেয়, বল ?

বীণাদি বলেছে চাকরির টাকা জমিয়ে জ্যোতিদাকে কলকাতা পাঠাবে চিকিৎসার জন্যে।

জ্যোতিদা রাজী হবে না।

আমারও তাই মনে হয়। জ্যোতিদা মরে যাবে তবু বীণাদির টাকা নিয়ে কলকাতা যাবে না।

সোমেন আরো এক গ্লাশ পানি খেয়ে ঢেকুর তোলে। শরীর এখন ঝরঝরে লাগছে। ক্ষিদে পেলে সবকিছু এলিয়ে যায়। ভূষণ বাটি, গামছা গুছিয়ে নিচ্ছে। ডাটা-চচ্চড়ি, আলু ভর্তা, কাচকি মাছ এইসবই তো ওদের নিত্যকার খাবার। তবু ভূষণের নিম্নমধ্যবিত্তের লজ্জা আছে, বিনয় প্রকাশ করে। সোমেনের এইসব বালাই নেই, ও এসব কাটিয়ে উঠেছে। জীবনকে সহজভাবে না নিলে ওটা সিন্দাবাদের মতো ঘাড়ের বোঝা হবে। ম্যাট্রিক পাশ করে রেলের ড্রাইভার হয়েও ভূষণের লজ্জা। এগুলো কবে খসবে ? সোমেন একটা বিড়ি ধরায়, ভূষণকে একটা দেয়।

এটা টানতে টানতে গেলে তোর আর ভয় লাগবে না। তেঁতুল তলার ভূত ঝেড়ে পালাবে। তখন পরী তোর পিছু নেবে। কি বলিস ! ভূষণ কিছু না বলে একগাল ধোঁয়া ছাড়ে। ওর কাছ থেকে তেমন সাড়া না পেয়ে সোমেন হঠাৎ করে জিজ্ঞেস করে,

মীরার খবর কি রে ?

খবর নেই।

কেন ?

গরিবের প্রেমের আবার খবর থাকে নাকি? চলি।

ভূষণ দরজার বাইরে পা রাখতেই সোমেন ওর ঘাড়ে হাত রাখে।

মন খারাপ করিয়ে দিচ্ছিস কেন সোমেন! নিষ্ঠুরের মতো আচরণ করিস না।

দুঃখ দিলাম তোকে?

দুঃখ নয়তো কি? তুই নিজেও জানিস নয়টা ভাইবোনকে বড় করতে করতেই আমি বুড়িয়ে যাবো, মীরাকে ঘরে আনবো কখোন?

ভূষণ সোমেনের হাত ছাড়িয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। নিজের ওপর রাগ হয় সোমেনের, সবটাই বড় বেশি এলোমেলো। ভূষণ যতক্ষণ ছিলো মুহূর্তগুলো অন্ধকারের মতো পেরিয়ে গেলো বুকের ওপর কালো মোটা দাগ টেনে। ও দরজা বন্ধ করে। পেয়ারা গাছের পাতা ছুঁয়ে স্নিগ্ধ বাতাস ঘরে দৌড়ে ফিরে। মুহূর্তে ও আপন বলয়ে ফিরে আসে, ভূষণ তোকে আমি বুড়িয়ে যেতে দেবো না। তোর দায়িত্ব আমিও ভাগ করে নেবো। ওর বুক থেকে অন্ধকার নেমে যায়। ও লিখতে বসে, "আমাদের বাসায় ইঁদুর এত বেড়ে গেছে যে আর কিছুতেই টেকা যাচ্ছে না। তাদের সাহস দেখে অবাক হতে হয়। চোখের সামনেই যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদলের সুচতুর পদক্ষেপে অগ্রসর হওয়ার মতো ওরা ঘুরে বেড়ায়, দেয়াল আর মেঝের কোণ বেয়ে-বেয়ে তরতর করে ছুটোছুটি করে। যখন সেই নির্দিষ্ট পথে আকস্মিক কোনো বিপদ এসে হাজির হয়, অর্থাৎ কোনো বাক্স বা কোনো ভারী জিনিষপত্র সেখানে পথ আগলে বসে, তখন সেটা অনায়াসে টুক করে বেয়ে তারা চলে যায়। কিন্তু রাত্রে আরও ভয়ংকর। এই বিশেষ সময়টাতে তাদের কার্যকলাপ আমাদের চোখের সামনে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে শুরু হয়ে যায়। ঘরের যে কয়েকখানা ভাঙ্গা কেরোসিন কাঠের বাক্স; কেরোসিনের অনেক পুরনো টিন, কয়েকটা ভাঙ্গা পিঁড়ি আর কিছু মাটির জিনিষপত্র আছে, সেখান থেকে অনবরতই খুটখুট টুং-টাং ইত্যাদি নানা রকমের শব্দ কানে আসতে থাকে। তখন এটা অনুমান করে নিতে আর বাকি থাকে না যে এক ঝাঁক নুব্জদেহ অপদার্থ জীব ওই কেরোসিন কাঠের বাক্সের ওপরে এখন রাতের আসর খুলে বসেছে।

যাই হোক ওদের তাড়নায় আমি উত্যক্ত হয়েছি, আমার চোখ কপালে উঠেছে। ভাবছি ওদের আক্রমণ করার এমন কিছু অস্ত্র থাকলেও সেটা এখনো কেন যথাস্থানে প্রয়োগ করা হচ্ছে না? একটা ইঁদুরমারা কলও কেনার পয়সা নেই? আমি আশ্চর্য হবো না, নাও থাকতে পারে।

আমার মা কিন্তু ইঁদুরকে বড়ো ভয় করেন। দেখেছি একটা ইঁদুরের বাচ্চাও তাঁর কাছে একটা ভালুকের সমান। পায়ের কাছ দিয়ে গেলে তিনি তার চার হাত দূরে দিয়ে সরে যান। ইঁদুরের গন্ধ পেলে তিনি সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন, ওদের যেমনি ভয় করেন, ঘৃণাও করেন। এমন অনেকের থাকে।" এতটুকু লেখার পর আর লিখতে ইচ্ছে করছে না। চোখ জড়িয়ে ঘুম আসছে। অথচ গল্পটা প্রগতি লেখক সংঘের আগামী বৈঠকে পড়তে হবে। ও খাতা বন্ধ করে হারিকেন নিভিয়ে দেয়। শরীরে ক্লান্তি থাকলে লেখা দুর্বল হয়ে যায়। এজন্য ও কখনো জোর করে লেখে না। বোঝে শরীরের সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্ক নিষ্ক্রিয় হয়ে যাচ্ছে, দুর্বল হয়ে আসছে স্নায়ু। ঘুমোবার আগে মনে হয় আগামীকাল ওর একটুও অবসর নেই, অনেক কাজ।

২

গত সপ্তাহে ও দক্ষিণ মৈশন্ডি পাড়া ছেড়ে এখানে এসেছে। ভূষণের আগ্রহেই এখানে আসা। ওর নিজেরও ইচ্ছে ছিলো। ও বুঝতো পাঠচক্রে যোগ দিয়ে মার্ক্সীয় দর্শন সম্পর্কে শিক্ষিত হওয়া যায় কিন্তু সাহিত্যে জনজীবনকে প্রতিফলিত করতে হলে শ্রমিকদের মাঝে এসে থাকতে হবে। সতেরো বছর বয়সে লেখালেখি শুরু করেছিলো, এখন উনিশ। দুবছর খুব কম সময়। কিন্তু ওর মনে হয় অভিজ্ঞতার অনেক পথ পেরিয়েছে। সঠিক পথ গ্রহণ করার সময় এসেছে। প্রগতি পাঠাগারের মার্ক্সীয় আলোচনা ওকে সাম্যবাদের নবজীবনে উদ্বুদ্ধ করেছে। ফলে ওর সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টেছে। উপরন্তু সতীশ পাকড়াশির সান্নিধ্য ওকে দেয় আশ্চর্য অনুপ্রেরণা। তিনি আন্দামান ফেরত টেররিস্ট বিপ্লবী দলের পুরোনো কর্মী। সোমেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো তার কথা শোনে। তিনি যখন জীবনের বিচিত্র ঘটনার কথা বলেন তখন ওর বুকে তৃষ্ণা প্রবল হয়ে ওঠে। তৃষ্ণা মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষার। প্রথম দিনের পরিচয়ে তিনি বলেছিলেন, "সাহিত্য রচনার পথেও বিপ্লবের কাজ হয়। তুমি দেশের দারিদ্র্যপীড়িত দুঃখী জনগণের আশা উদ্যমহীন জীবনের কথা দিয়ে জীবন্ত গণসাহিত্য তৈরি কর—তা হলে তোমার ইপ্সিত স্বাভাবিক কর্মপথই ভবিষ্যৎ গণ-বিপ্লবের পথ প্রস্তুতির সহায়ক হতে পারে।" সেদিন ওরা বুড়িগঙ্গার পাড়ে বসেছিলো। অমৃত এবং কিরণও ছিলো সঙ্গে। বক্তা একাই ছিলো সতীশ, ওরা শ্রোতা।

বৃটেনের বিপ্লবী কমিউনিস্ট রালফ ফক্সের স্পেনের আন্তর্জাতিক বাহিনীতে যোগদান এবং মৃত্যু বরণের প্রসঙ্গ নিয়েই কথা হচ্ছিলো বেশি। সতীশের কথা শুনতে শুনতে সোমেন একসময় বলে ওঠে, সতীশদা সাহিত্যিকও মরণের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়লো ?

হ্যাঁ রে সোমেন, এমনি হয়। অত্যাচার যখন চরমে ওঠে, মানবতার বিকাশ যখন রুদ্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়, তখন কলম ছেড়ে তরবারি ধরতে হয়—বুকের রক্তে তখন নূতন সাহিত্য তৈরি হয়। ধন-শোষণ মদমত্ত ফ্যাসিস্ট বর্বরতার বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে কবি ও সাহিত্যিকগণ তাই স্পেনের আন্তর্জাতিক বাহিনীতে ছুটে গিয়েছিলেন। সাহিত্যসাধনায় লাঞ্ছিত গণমানবের মর্মকথা ফুটিয়ে তুলবার যে প্রেরণা, সেই প্রেরণাই লেখককে গণমানবের মুক্তি-সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার শক্তি দিয়েছে। সতীশের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনে সোমেন ওঁর হাত চেপে ধরে, সতীশদা এরাই তো সত্যিকারের সাহিত্যিক। সোমেনের বুকে বুড়িগঙ্গার জোয়ার উত্তাল হয়। সতীশ পাকড়াশি ওকে এক ভিন্ন জগতে নিয়ে এসেছে। এখন ওর দরকার নিজের শক্তি খাটিয়ে তাকে বসবাসের যোগ্য করে তোলা। প্রথম দিকের লেখা গল্প রাত্রিশেষ, স্বপ্ন, একটি রাত ইত্যাদির জন্য ওর কেমন লজ্জা করছিলো। এইসব অভিজ্ঞতাবর্জিত হাল্‌কা লেখা আসলে মূল্যহীন। মানুষের মূলে প্রবেশ করতে না পারলে ব্যর্থ হতে হবে। এই ব্যর্থতার দায়ভাগ এড়ানোই এখন ওর রাতদিনের ভাবনা। যতই দিন যাচ্ছে ততই খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসা নতুন জীব হয়ে বাড়ছে। নিজের ওপর আস্থা বাড়ে। টুকরো টুকরো আরো নানা গল্প করে যাচ্ছে সতীশ পাকড়াশি। সোমেনের কানে কিছু যাচ্ছে না। ও এখন নতুন ভুবনের নতুন নির্মাণের পরিকল্পনায় ব্যস্ত। রাত বাড়ে। বুড়িগঙ্গার বুকে চাঁদের ছায়া পড়ে। বাতাসে বকুল ফুলের গন্ধ। একসময় বাদামের খোসা পায়ে মাড়িয়ে ওরা বুড়িগঙ্গার পাড়ে পাড়ে ঘুরে ফেরে।

অমৃত বলেছিলো, সতীশদার এইসব কথা সোমেনই ভালো ফোটাতে পারবে। গল্পে আমাদের মধ্যে ও-ই সবচেয়ে শক্তিশালী। তোকে দিয়েই হবে রে সোমেন। কি বলিস কিরণ ?

হ্যাঁ আমিও তাই ভাবছি।

সোমেন কথা বলে না। চুপচাপ হাঁটে। সতীশ পাকড়াশি উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, আমিও ওকে দারুণ ভরসা করি। সোমেন কিছু বলতে পারে না। এমনিতেই ও কম কথা বলে। শ্রবণ এবং প্রয়োজনমাফিক

আত্মস্থ ওর চরিত্রের ধর্ম। তার কিছুদিন পরই ও দক্ষিণ মৈশন্ডি পাড়া ছেড়ে রেলওয়ে শ্রমিকদের এই কলোনীতে এসে ওঠে।

এখানে এসে একটি উপন্যাসে হাত দিয়েছিলো 'বন্যা' নামে। শেষও করেছিলো কিন্তু ছাপার জন্যে আর নির্মল ঘোষকে পাঠানো হয় নি। তিনি 'সবুজ বাংলার কথা' সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক। কদিন আগে তাঁর পাঠানো পত্রিকা পেয়েছে। উত্তর লেখা হয় নি। আজ লিখবে ভেবে মনে মনে গুছিয়ে নেয়। একটু আগে শামসুর বৌ-কে দেখে ফিরেছে। শামসুর বাসাতো নয় যেন একটা প্রেতপুরী। তিন-চারটে রোগা ছেলেমেয়ের কোটরগত চোখ, সুতিকায় আক্রান্ত শামসুর বৌ রক্তহীনতায় ফ্যাকাসে, মরণাপন্ন। বাবার পাঠানো বিশটা টাকা শামসুর হাতে দিয়েছে ওর বৌ-র ঔষধ কেনার জন্যে।

শামসু পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়েছিলো, দাদা আপনি আমাকে বাঁচান।

এইসব দুর্বল মুহূর্তে সোমেনের মুখে কথা আসে না। নিমেষে ভাষা উধাও হয়ে যায়। অথচ শ্রমিক ইউনিয়নের সভায় যখন অনর্গল কথা বলে তখন মনে হয় না ওর ভাষার কোনো অভাব আছে। কিন্তু মানসিক দুর্বল মুহূর্তগুলো ওকে একদম অসাড় করে ফেলে। বলতে পারে না, শামসু তোমাদের মতো শতজনের ফসিল দিয়ে আমরা জীবনের নতুন রেলের লাইন বসাবো। আমরা তো সেই পথেই এগুচ্ছি।

ভাঙা চোয়াল-সর্বস্ব শামসু শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। সোমেন ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে।

বিপদে ধৈর্য হারাতে নেই শামসু। ভয় কি, আমরা তো আছি? তোর বৌকে হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করছি।

শামসু আশ্বস্ত হয়ে চোখ মোছে। ও হাত ছাড়িয়ে পথে নামে। বিদ্যাসাগরী চটিতে ফটফট শব্দ ওঠে। সেইসঙ্গে ওড়ে ধুলো, পায়ের আশপাশ শাদা হয়ে যায়। ও ঘরে ফিরে হাতমুখ ধুয়ে লিখতে বসে। আজ নির্মল ঘোষকে চিঠির জবাব দিতে হবে।

ঢাকা
১০।১০।৩৮

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

...'সবুজ বাংলার কথা' পেয়েছি। ভালো লাগলো।... আপনার এবং পত্রিকার নীতি আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ মেলে, বিশেষতঃ—'অর্থনৈতিক

পীড়নের দুঃসহ ক্লেশ যাদের মনে সৃষ্টি করেছে প্রচণ্ড ক্ষোভ যে ক্ষোভ ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির লাভা প্রবাহে এক একদিন আত্মপ্রকাশ করে, নিমেষের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় বহু শতাব্দীর সঞ্চিত অসাম্য ও বঞ্চনার অহমিকা, যৌবনের পথ নির্দেশ তো তারাই দেবে।... আজ বিপ্লবের প্রয়োজন হয়েছে, এ বিপ্লব দেবে আমূল সংস্কার।' খুবই ভালো লাগলো, আমি নিজেই অনুভব করছি যেন।... আমার এই বিপ্লবের অনুভূতি সাহিত্য-সাধনার সর্বাঙ্গে যেন জড়িয়ে থাকে।

আর এই বিপ্লবের অনুভূতি কেবল আমার নয়, আরো অনেক সাহিত্য-সেবকের মনেই জেগেছে মনে হয়, তার মধ্যে অনেকেই প্রকাশ করতে পারছে না, বা অনেকের কণ্ঠই ক্ষীণ হয়ে গেছে তথাকথিত সাহিত্য ডিক্টেটরদের গোলমালে। কিন্তু সেই অনুভূতির অস্তিত্ব আছে অনেকের মনেই। এই সব দেখে মনে হয়, আগামী দশ বছরে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস হবে একটা উজ্জ্বল অধ্যায়, একটা বৈপ্লবিক অপূর্ব সৃষ্টি। আমার অনুভূতি আর আমি নিজে... এই ঢাকা শহরে একা।

ইতি—
আপনাদের সোমেন

পুঃ। আপনাকে একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। আমার দিনগুলি এখন মনোরম আরো অনেক, আপনাকে বলতে বাধা নেই, অনেক মানসিক (সাংসারিক) বিপর্যয়, বাধা-বিপত্তি এড়িয়েও এখনকার দিনগুলি কী ভালো লাগে! তার প্রধান কারণ, উপন্যাস লেখার উত্তেজনা। কবে শেষ হবে সেই চিন্তাই করি।

এখনকার রাতগুলো আমার জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকলো। (আর আপনি তার প্রথম শ্রোতা)। উপন্যাস লেখা ব্যর্থই হোক আর অব্যর্থই হোক, মাঝে মাঝে এক একটি রাত কখন যে শেষ হয়ে যায়, টেরও তো পাইনে।

নির্মল ঘোষের 'আধুনিক সমাজ ও তার আড়ালে প্রচ্ছন্ন মানস-বিপ্লবের সম্পর্ক' পড়ে ওর খুবই ভালো লাগে। চিঠিটা শেষ করে খামে পুরে রাখে। ইঞ্জিনের হুসহুস শব্দ আসছে। এই শব্দটা ওর

যাওয়া হবে না। এখন গেলে ইউনিয়নের মধ্যে একটা ফাটল ধরবে। সামান্যতম সুযোগ ছেড়ে দিতে ও রাজী নয়।

দক্ষিণ মৈশন্ডির জোড়পুল লেনে মার্ক্সবাদীদের অফিস। এখানে প্রতিদিনই শ্রমিকদের বৈঠক হয়। আলোচনা হয় শ্রমিক শ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকা আর মুক্তির পথ নিয়ে। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা নেই প্রতিদিনই সোমেন উপস্থিত থাকে। সবার সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। ওর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতায় বয়োজ্যেষ্ঠরা খুশি। তা ছাড়া 'প্রগতি পাঠাগার' স্থাপন করে ও সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। নেতারা বলে, সোমেন ভারি কাজের ছেলে, ভারি চমৎকার। এখানে বন্ধুদের নিয়ে ওর পড়াশোনা চলে, ভাবের আদান-প্রদান হয়। বন্ধুদের মধ্যে অমৃত খুব স্বচ্ছল। বাপের টাকা ওর পকেটে সবসময় থাকে। প্রায়ই সবাইকে নিয়ে চা-সিঙ্গারা খায়। তখন হালকা হাসি-তামাশায় জমে ওঠে আসর। মনে হয় না ওদের জীবনে কোনো সমস্যা আছে।

সেদিন চা খেতে খেতে সরলানন্দ ওকে ঘায়েল করে, তোর প্রেমিকা কেমন আছে সোমেন ?

সোমেনের তো চক্ষু ছানাবড়া। বাকিরা হৈ-হৈ করে ওঠে, ব্যাপার কি, ব্যাপার কি, আমরা কিছুই জানলাম না ? সব খুলে বল সরলানন্দ !

উঁহু, তা হবে না। সোমেনকেই জিজ্ঞেস কর।

প্রথমে ঘাবড়ে গেলেও পরমুহূর্তে সামলে নেয় সোমেন। বেশ ধীরে-সুস্থে চা খায়। কারো দিকে তাকায় না। ভাবখানা এমন যে তোমাদের আমি খেলিয়ে তুলবো। দেখি কতক্ষণ খেলতে পারো। সরলানন্দ সরবে বলে, দেখেছিস কেমন ঘোড়েল। একদম ঘাপটি মেরে আছে।

অমৃত ওর কাঁধ খামচে ধরে, কি কিছু বলবি না ?

নিজের কথা নিজে কি বলা যায় ? সরলানন্দই বলুক।

সোমেন গম্ভীর, মিটিমিটি হাসিতে সরলানন্দের দিকে তাকিয়ে থাকে। বুকের মধ্যে কিছুটা সুখের কাঁপন, সত্যি যদি তেমন কেউ থাকতো। এদের এইসব ওর ভালোই লাগছে।

না, তুইতো গল্প লিখিস। তুই গল্পের মতো করে বল রসিয়ে, জমিয়ে।

কিরণ ওকে তাড়া দেয়। কিন্তু সোমেনের কাছ থেকে কিছুই আদায়

আরে বাবা রোজ রাতে ওর ঘরে এক ধেড়ে ইঁদুর আসে। ভালোবাসা না পেলে কি—শেষ করা হয় না। সকলে হো-হো করে হেসে ওঠে। বিষম খায় সোমেন নিজে। তুই একটা আস্ত বানর সরলা। এমন বাজে ইয়ার্কি হয় না।

তুই বল ইঁদুরটা তোকে ভালোবাসে না !

বাসে, বাসে।

সোমেন মুখ লাল করে বলে।

এই জন্য আর এক রাউন্ড চা হয়ে যাক।

অমৃত বয়কে ডাকে। আবার চা আসে। আড্ডা দ্বিগুণ হয়ে ওঠে।

সোমেন বলে, আগামী মঙ্গলবারের সাহিত্য আসরে কিরণ কবিতা পড়বে। অমৃত গল্প।

আমি সমালোচনা করবো, সরলানন্দ বলে।

তাতো করবি ঐটা সবচেয়ে সহজ কিনা।

হ্যাঁ সহজ কাজটাই আমি চাই। কঠিনটা তোরা করবি।

সরলানন্দ নির্বিকার উত্তর দেয়।

তবে সরলা কিন্তু ভালো সমালোচক। সমালোচনার নামে পিঠ চুলকায় না।

ঠিক বলেছিস।

সবাই একবাক্যে সায় দেয়।

অনেক রাতে পথে নামে ওরা। রাস্তা তখন নির্জন। একটা রিক্সা নেই, ঘোড়ার গাড়িও না। ফাঁকা রাস্তায় হাঁটতে কি যে আনন্দ ! মনে হয় বিজয়ের উৎসবে তুড়ি মেরে পথ চলা। একসময় সরলানন্দ, অমৃত, কিরণ অন্যদিকে চলে গেলে থাকে শুধু রণেশ আর ও।

তুই আমার সঙ্গে চল রণেশ, আমার ওখানে থাকবি।

চল আপত্তি নেই। পথে যখন নেমেছি তখন সব ঘরই আমার ঘর।

দুবন্ধু রাস্তা কাঁপিয়ে হাসে। মাঝে মাঝে এমন প্রাণখোলা হাসিতে বুক খোলাসা হয়ে যায়। রণেশ ওর ঘাড়ে হাত দিয়ে হাঁটে। রণেশ লম্বা, পাতলা গড়নের, ধারালো চেহারা, যেন তীক্ষ্ণতা ঠিকরে পড়ে। সোমেন উল্টো। বেঁটে-খাটো মানানসই চেহারা। মাথা দেহের তুলনায় আয়তনে বড়। মুখ চ্যাপ্টা, দুপাশের চোয়াল একটু উঁচু। বড় মায়াময় নীলচে চোখ দুটি স্বপ্নালু। রণেশের মধ্যে আছে বয়স্কের গাম্ভীর্য, সোমেন ধীর, স্থির এবং তারুণ্যের দ্যুতিতে ঝলমলে।

রণেশ হাসতে হাসতে বলে, আচ্ছা সোমেন আমরা কি কাউকে ভালোবাসবো না ?

সময় কৈ এসব ভাববার ?

সোমেনের উঁচু কণ্ঠের হাসিতে রাস্তার নিস্তব্ধতা ভেঙে যায়। রণেশ কথা বলে না।

তুই একদম চুপ মেরে গেলি যে ?

রণেশ মাথা নাড়ে।

ভালোবাসা আমার চাই। তাই ভাবছি।

কি।

এমন একটি মেয়েকে বিয়ে করবো যে মার্ক্সবাদ বুঝবে।

ঠিক। তবে তেমন মেয়ে পেতে হলে তৈরি করে নিতে হবে। বীণাদির মতো মেয়ে কজন হয় বলতো ?

ঠিক বলেছিস সোমেন। বীণাদির জন্য কষ্ট হয়।

জ্যোতিদা আর বীণাদির জন্য আমার বুক ফেটে যায়।

সোমেনের কণ্ঠ ভারি হয়ে যায়। রণেশও কথা বলে না। বড় রাস্তা ছেড়ে ওরা রেল লাইনের ওপর দিয়ে হাঁটে। এটা সর্টকাট রাস্তা। রেল লাইনের ওপরে এলে সোমেনের হাঁটা দ্রুত হয়। ওর পরিচিত অভ্যস্ত রাস্তা, তাই পা রাখলেই নিজস্ব ভুবনের উত্তেজনায় শরীর গতি পায়।

কি ব্যাপার তুই যে ঘোড়ার মতো দৌড়ুতে শুরু করলি সোমেন ?

রণেশ দৌড়ে ওর সঙ্গ ধরে।

রেলের ওপর দিয়ে আমি এভাবেই হাঁটি।

না বাপু তোর সঙ্গে তাল রাখা আমার পক্ষে সম্ভব না, একটু আস্তে হাঁট না ?

রণেশ ওর হাত টেনে ধরে।

আজ রাতে আমরা ঘুমুবো না রণেশ ?

কেন ?

তোকে সঙ্গে নিয়ে Illusion and Reality বইটা শেষ করবো। অর্ধেকটা পড়েছি।

ওটাতো আমি আগেই শেষ করেছি।

জানি। তোর কাছ থেকে কিছু কিছু জায়গা বুঝে নেবো। জায়গায় জায়গায় ইংরেজিটা বড্ড কটমটে লাগে।

তাই বলে সারারাত জেগে ?

রণেশের কণ্ঠ করুণ শোনায়।

পড়তে পড়তে অনেক সময় আমার তো রাত ফুরিয়ে যায়। আমি যে দিনের বেলা সময় পাই না।

তোর ধৈর্য আমাকে অবাক করে। তোকে দিয়েই হবে রে, সোমেন। আমাদের গণসাহিত্যে তোর লেখনি নতুন ধারা সংযোজন করবে।

বেশি বলে ফেললি। তোরা আমাকে সবসময় এমন ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে কথা বলিস কেন বল তো ?

একটুও বেশি না। এটা ভাবার তোর কোনো কারণই নেই।

যাক বাজে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই।

নিজের লেখা তুই সবসময় লুকিয়ে রাখতে চাস কেন বল তো ?

কি ছাইপাশ লিখি তা নিয়ে আবার বাহাদুরি ?

সোমেন হাত দিয়ে অবজ্ঞার ভাব করে।

তার মানে তুই আমাদের বিচার-বিবেচনার ওপর কটাক্ষ করছিস ?

আরে রাখ তো এসব কথা। অন্য কিছু বল।

রণেশ চুপসে যায়।

তোর বাড়ির খবর কি রণেশ ?

জানি না।

রেগেছিস মনে হয় ?

হ্যাঁ কখনো তোর আচরণ এমন রাগিয়ে দেয়। ইচ্ছে করে তোকে চাবিয়ে খেয়ে ফেলি।

সোমেন হো-হো করে হাসে। কারখানার পেছন দিয়ে সরু রাস্তায় ঢুকে ওরা ঘরের কাছে পেঁছে যায়। পায়ের নিচে কয়লার কুচি মচমচ করে। শেডঘর থেকে তেল আর কাঁচা কয়লার ধোঁয়ার গন্ধ আসছে। গন্ধটা ভালোই লাগে সোমেনের। ভূষণ ওকে একবার এঞ্জিনে চড়িয়ে নারায়ণ-গঞ্জে নিয়ে গিয়েছিলো। বেশ লেগেছিলো সেদিন। এমনিতে কোথাও যাওয়া হয় না, হাজার কাজে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। তাই সেদিন মনে ছিলো বেড়ানোর আনন্দ। রাস্তার পাশে সরষে শাক তুলতে তুলতে ডুরে শাড়ি পরা মেয়েটি অবাক হয়ে ট্রেন দেখছিলো। ভূষণ ওকে কনুই দিয়ে গুঁতো দিয়ে বলেছিলো, মেয়েটি ভারি মিষ্টি না রে সোমেন ? ভূষণের চকচকে দৃষ্টিতে মুগ্ধতা চুঁইয়ে পড়ে। সোমেনের মনে হয়েছিলো ভূষণের প্রচুর অভাববোধ আছে! মেয়ে দেখলে ওর অনুভূতি পাল্টে যায়। ও মুখে স্বীকার করে না ঠিকই অবচেতনে তা প্রকাশ হয়ে পড়ে। এই একটি জায়গায় মানুষ বড় অসহায় হয়ে যায়। গোপন ভাবনা কেমন করে বলে ফেলে যে টেরই পায় না। ভূষণের জন্য ওর কিছু করা দরকার।

ঘরে পৌঁছে গেলে পকেট হাতড়ে চাবি বের করে সোমেন। দিয়া-শলাই জ্বালিয়ে হারিকেন ধরায়। ধেড়ে ইঁদুরটা ঘরে আছে কিনা টের পায় না। ঘরে ভ্যাপসা গরম। রণেশ এগিয়ে জানালা খুলে দেয়। সোমেন জগ থেকে পানি ঢেলে খায়। চা-সিঙ্গাড়া যা খেয়েছে তাতে রাত চলে যাবে। নিশ্চয় ভূষণ খাবার নিয়ে এসে ফিরে গেছে। এমন প্রায়ই হয়, ও কিছু মনে করে না। শুধু অভিযোগ জানায়, এমন করলে অসুস্থ হয়ে পড়বি। সোমেন মৃদু হাসে। দীর্ঘদিন প্লুরিসিসে ভুগে শরীরটা আর ঠিকই হলো না। আসলে ও মনের জোরে শরীরকে উপেক্ষা করে, খুব কষ্ট হয় না। বরং রাত-দিনের পরিশ্রমে সময় কি করে কাটে টেরই পায় না। শরীর যদি একদম অচল হয়ে না পড়ে তাহলে ওটা নিয়ে ভাবতে ও রাজী নয়। ওরতো কোনো অসুবিধে নেই। কখনো পার্টি অফিসে কেউ যদি বলে, শরীরটা বুঝি তোমার ভালো নেই সোমেন? তখন ওর রাগ হয়। অহেতুক গায়ে পড়ে শরীর সম্পর্কে কথা বলা ওর একদম পছন্দ না।

আমাকে এক গ্লাশ জল দে সোমেন।

রণেশ 'প্রভাতী' পত্রিকা ওল্টাচ্ছে।

আরে 'প্রভাতী'-তে তোর গল্প বেরিয়েছে কই বলিস নি তো?

রাখ।

সোমেন কাগজটা হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়।

কেন দেখলে কি হয়? তা হলে লিখিস কার জন্যে?

অন্তত তোর জন্যে নয়।

সোমেন দাঁত খিঁচিয়ে জবাব দেয়। রণেশ হেসে ফেলে।

তোর স্বভাবটা বদলালো না।

জানিস রণেশ মাঝে মাঝে ভীষণ কষ্ট হয়।

কেন রে।

বিদ্যেতো মোটে ম্যাট্রিক। অনেক সময় ভালো ভালো ইংরেজি বই পড়ে বুঝি না। যখন মার্ক্স বা লেনিনে ঠোক্কর খাই তখন নিজের চুল ছিঁড়ি। ইস ভাষাটা যদি ভালো করে জানতাম মন ভরে পড়তাম। এই কাজটি প্রাণ ভরে করতে পারলে বুঝতাম শ্রমিক রাজ কায়েম করেছি।

এর কোনো মানে হয় না। তুই অনেকের চাইতে চমৎকার ইংরেজি জানিস।

মিথ্যে আশ্বাস দিস না। আমি জানি আমার তল কতটুকু।

সোমেন জগ গ্লাশ সরিয়ে কাঠের বাক্সের ওপরটা খালি করে মোড়া টেনে নিয়ে লিখতে বসে। আর তিন-চারটে দরখাস্ত বাকি আছে। রাতেই লিখে ফেলবে। সকালে শ্রমিকরা কাজে যাবার আগে আসবে ওগুলো নিতে। প্রতিদিনই কুড়ি-পঁচিশটা দরখাস্ত লিখতে হয়। ও না লিখে দিলে ওদের উপায় নেই।

ইউনুসকে নিয়ে আর পারি না রে রণেশ !

কেন ?

ইদানীং মদ বেশি খায়। হল্লাও করে প্রচণ্ড। বউটাকে মারধোর করে।

কি করছিস ?

অন্য সবার চাইতে ওর দিকে বেশি নজর দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করছি। তা কি আর বুঝতে চায়।

সময় লাগবে।

সেই অপেক্ষায় আছি। তবে বড় ভালো লোক রে। নিজের হাতে পয়সা থাকলে আর একজনের বিপদে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কত বিচিত্র মানুষ ! এদের এখানে না এলে আমার অনেক কিছু জানা বাকি থেকে যেতো রণেশ।

তুই ওদের বেশি ভালোবাসিস। তাই তো নেতারা বলে শ্রমিক সংগঠনে সোমেন যে এমন সাকসেসফুল হবে আমরা ভাবি নি। তোকে ইউনিয়নের সেক্রেটারি করার চিন্তা-ভাবনা হচ্ছে।

যাঃ কি যে বলিস। এত বিচক্ষণ নেতারা থাকতে আমাকে এই গুরুদায়িত্ব দেয়া কেন ? আমার বয়সই-বা কি ?

বয়স দিয়ে কি আর সব বিবেচনা হয়। তোর মতো মার্ক্সবাদ এমন করে কে শিখেছে বল ? তোর কাছে তো এটা শুধু রাজনৈতিক মতবাদ নয় বা পুথিগত তত্ব নয়। মার্ক্সবাদ তোর কাছে জ্বলন্ত বিশ্বাস, এক অবশ্য পালনীয় ধর্ম। ঠিক বলি নি ?

সোমেন মাথা নাড়ে। আজ ওর চোখে ঘুম নেই। বারবারই মনে হয় আজকের রাতটা অন্যরকম রাত। কোনো কারণ নেই ভাবার, তবু ভাবে। মনে হয় অনেকদূর থেকে মা-র কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে, সোম, বাবা সোম। বাইরে নাইটগার্ডের বাঁশি বাজে।

তোর ঘুম আসছে না সোমেন ?

না তো। তুই ঘুমাবি ?

হ্যাঁ।

আমরা Illusion and Reality পড়বো না ?

আর একদিন।

ঠিক আছে ঘুমো !

তুই ?

একটু পরে।

অল্পক্ষণে রণেশ ঘুমিয়ে যায়। সোমেন দরখাস্তগুলো গুছিয়ে রাখে। হারিকেনের সলতে কমিয়ে দিলে ইঁদুরের খুট্‌খুট্‌ শব্দ শুরু হয়। ও মশারি খাটিয়ে দেয়। রণেশ পাশ ফিরে শোয়। কি যেন বিড়বিড় করে। রাত কতো বুঝতে পারে না সোমেন। ওর কাছে কোনো ঘড়ি নেই। ও বই দিয়ে হারিকেন আড়াল করে মোড়া টেনে বই খুলে বসে। চোখের সামনে মিছিলের মতো অক্ষর ভেসে ওঠে। সোমেন সেই মুখমণ্ডল-সম্বলিত শব্দরাজির মধ্যে নিমগ্ন হয়ে যায়।

৩

একদিন খবর এলো যুদ্ধের। সবার মুখে এককথা যুদ্ধ যুদ্ধ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো। একদিকে বৃটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যান্ড প্রভৃতি এবং আরেক দিকে জার্মানী, ইটালী, অস্ট্রিয়া প্রভৃতি। সোমেন বোঝে এটা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের ভাগ-বাটোয়ারার যুদ্ধ। হিটলারের ফ্যাসিবাদী জার্মানী এবং চার্চিলের বনেদী সাম্রাজ্যবাদী বৃটেন যুদ্ধে জড়ালো নিজেদের অন্তর্বিরোধ মেটাতে না পেরে। কিন্তু এদের মূল উদ্দেশ্য বিশ্ববাসীর কাছে গোপন ছিলো না। দিনের আলোর মতো প্রকাশ্য ছিলো সেই হীন চক্রান্তের নগ্ন স্বরূপ। হিটলার সহ সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো সামরিক সজ্জায় সজ্জিত হচ্ছিলো এবং পরস্পরকে সাহায্যও করছিলো মার্কিন ডলারের নয়া ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যস্ততায়। বিড়ালের মতো নিঃশব্দে ইঁদুর মারার উদ্দেশ্য ছিলো ওদের লক্ষ্য। সে লক্ষ্য একটা বিন্দুতেই সীমাবদ্ধ ছিলো—নতুন রাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নকে বিনষ্ট করে ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিকাশের পথ রুদ্ধ করা। সঙ্গে সঙ্গে এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করা। এরা স্পেনের গণপ্রজাতন্ত্রী সরকারকে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর মারফত উৎখাত করেছে। যুদ্ধের খবর সোমেনকে বিশেষ আলোড়িত করে। এখন সেপ্টেম্বর। কয়েকমাস আগে ঢাকায় 'প্রগতি লেখক সংঘ' স্থাপিত

হয়েছে। সংঘের কাজ নিয়ে ও ভীষণ ব্যস্ত। উপরন্তু 'প্রগতি পাঠাগার'-এর দায়িত্ব পড়েছে ওর ওপর। নিয়মিত সেখানে হাজিরা দিতে হয়, নতুন নতুন ছেলেরা আসে, ওদের সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগে। মার্ক্সবাদে বিশ্বাসী নয় এমন কিছু লেখক এখানে নিয়মিত আসে শুধুমাত্র সঙ্ঘের মানবিক, বিপ্লবী ও কল্যাণকর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে। এক এক বার এক এক সভ্যের বাড়িতে সভা হয়। কখনো নারিন্দায়, কখনো দক্ষিণ মৈশন্ডী, কখনো কোর্ট হাউস স্ট্রীট, পাটুয়াটুলি, সূত্রাপুর কিংবা গেন্ডারিয়ায়। সভাগুলোর আয়োজন করতে হয় সোমেনকে। সন্ত্রাসবাদী স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বিমল, তিনি এখন কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছেন। কপালের ওপর একটা বড় কাটা দাগ আছে, তবু শান্ত-ধীর, দৃঢ় প্রত্যয়ী বিমলের চেহারায় যেন আলাদা সৌন্দর্য আছে। সোমেন কখনো হাঁ করে দেখে, ভাবে মানুষগুলো স্বাধীনতার জন্যে কেমন জীবন তুচ্ছ করেছিলো। হোক ভুল পথ তবু ত্যাগে দ্বিধা ছিলো না।

'প্রগতি লেখক সংঘ'-র প্রথম সম্পাদক রণেশ দাসগুপ্ত। কিন্তু তার পক্ষে বেশি সময় দেয়া সম্ভব হয় না। রণেশ সাপ্তাহিক 'সোনার বাংলা' পত্রিকায় সহকারী সম্পাদক হিশেবে যোগদান করেছে। অতএব খাটনিটা সোমেন নিজেই ঘাড়ে নিয়েছে। বয়সে রণেশ ওর চাইতে একটু বেশি বড় হলেও ওর সঙ্গেই সোমেনের প্রীতির সম্পর্ক বেশি। কেননা মার্ক্সবাদী সাহিত্যের পড়াশোনা রণেশের সবচেয়ে বেশি। ওর কাছে বইপত্রও আছে। গোপনে এনে পড়া যায়। কত লুকিয়ে যে কাজ করতে হয়। একদিন সভা শেষে বসেছিলো বিমল আর ও। বিমল অকপটে স্বীকার করেছিলো যে তাদের পথটা ভুল ছিলো। সন্ত্রাসের পথে মঙ্গল নেই।

হ্যাঁ, আমি আপনার কাছে এটাই শুনতে চেয়েছিলাম বিমলদা।
জীবনের অনেকটা সময় অপচয় হয়ে গেলো সোমেন।
দুঃখ কিসের এখন নতুন করে গড়ুন।

আমাদের দিন তো ফুরিয়েছে। এখন তোমাদের মতো তরুণরাই পথ দেখাবে। আমরা তোমাদের অনুগামী হবো।
কি যে বলেন বিমলদা ?
ঠিকই সোমেন। তোমার কর্মক্ষমতা আমাকে দারুণ আলোড়িত করে। যদি তোমার বয়সটা ফিরে পেতাম !
বিমল সোমেনের পিঠ চাপড়ে দিয়ে হা-হা হাসে।

তাহলে আপনি মনে করছেন যে স্বাধীনতা সংগ্রাম অসহযোগ আন্দোলন, খণ্ড খণ্ড সশস্ত্র বিপ্লব-প্রয়াস ও সন্ত্রাসবাদী কার্য-কলাপের স্তর থেকে গণবিপ্লবের স্তরে উঠে আসছে ?

হ্যাঁ সোমেন ঠিকই বলেছো। এখন প্রয়োজন জনগণের সুসংগঠিত চেতনা। এই দায়িত্ব এখন তোমাদের। তোমাদের লেখনি মানুষের চেতনার পরিবর্তন ঘটাবে, সাংস্কৃতিক উত্তরণের পথ তরান্বিত করবে।

'প্রগতি পাঠাগার'-এ নতুন লিখিয়েরা যোগদান করে বলে ওদের দৃষ্টিভঙ্গি অনেক বদলে যাচ্ছে বিমলদা। ওরা বুঝতে পারছে যে শুধুমাত্র আত্মগত ভাবসৃষ্টি আর নয় এবার বস্তুগত সৃষ্টি করতে হবে। গণ মানুষের কথা বলতে হবে। বঞ্চনা, শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। জানেন বিমলদা ওদের এই পরিবর্তন আমাকে ভীষণ আনন্দ দেয়। আপনি রণেশের লেখা পড়বেন। ওর হাতটা দারুণ। জানেন কিরণের নতুন কবিতার বই বেরিয়েছে 'স্বপ্ন কামনা' নামে। জীবনানন্দ দাশ ভূমিকা লিখেছেন।
তাই নাকি, আমি এখনো দেখি নি।
আমি আপনাকে পড়তে দেবো। আর অমৃত করছে অনুবাদ। ও ইটালীর বিখ্যাত উপন্যাস 'ফান্টামারা'র অনুবাদ করেছে। শিগ্গি বই হয়ে বেরুবে। সামনের সপ্তায় নারিন্দার ঐ লাল দোতলা বাড়িটায় সাহিত্যসভা হবে বিমলদা, আপনি আসবেন কিন্তু !

হ্যাঁ, অবশ্যই আসবো। রাত হয়ে গেছে আজ যাই। তুমি যাচ্ছো ?
না। ভাবছি এই শতরঞ্চির ওপর ঘুমিয়ে থাকি। আমাকে তো আবার লেখক সংঘের জন্য নতুন সভ্য সংগ্রহ করতে হয়, যারা পুরোনো তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে খবর দিতে হবে। তিনজনের বাড়ি এখান থেকে কাছে। সকালে উঠেই ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করবো।
খাবে কি ?
কাছের রেস্তোরাঁ থেকে এক কাপ চা খেয়ে আসবো।
তাতেই হবে ?
সোমেন লাজুক হাসে।
আজকে পকেট একদম খালি। এতেই হবে বিমলদা।
বিমল বুক পকেট থেকে দুটো টাকা বের করে।
তুমি এটা রাখো।
না বিমলদা।

বসাছি রাখো।

আমার তো কষ্ট হয় না।

বিমল রেগে যায়।

বেশি পাকামো কোরো না। নাও, বড় ভাই হিশেবে আমার হুকুম তোমাকে নিতে হবে।

সোমেন মুখ কাচুমাচু করে নেয়।

চা নয়, ভাত খেও। না খেলে আমি ভীষণ কষ্ট পাবো।

এত টাকা তো লাগবে না।

রাখো, রেখে দাও। পরে কাজে লাগবে।

বিমল অন্ধকারে মিলিয়ে যাবার পরও সোমেন বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে। কারো কাছ থেকে এই ধরনের ব্যবহার পেলে ওর কেবলই মা-র কথা মনে হয়। যেন মা ডাকছে সোম, সোম। দূরাগত সেই ধ্বনি ঢাকা শহরের বুকের ওপর দিয়ে দ্রুতবেগে ধেয়ে আসে। গতকাল মা ওর জন্যে মুড়ি আর পাটালি পাঠিয়েছে। এখনও খাওয়া হয় নি। মা খুব করে যেতে বলেছে। লিখেছে, 'সোম কতদিন তোকে দেখি না, একবার এসে ঘুরে যা বাবা।' হঠাৎ করে চোখে পানি এসে যায়। দ্রুত দরজায় তালা লাগিয়ে পথে নামে, একটু পর রেস্তোরাঁগুলো সব বন্ধ হয়ে যাবে। ঘরে ফিরে ও রোঁমা রোঁলার **I will not rest** খুলে বসে। গীর্জায় তখন এগারোটার ঘণ্টা পড়ে। অকস্মাৎ সব নিঝুম হয়ে যায়। সোমেনের মাথার সামনে হারিকেনের টিমটিমে আলো। ও শুয়ে শুয়ে পড়ে। এভাবে পড়তেই ও ভালোবাসে। বাইরে রাতের অন্ধকার গাঢ় হয়, ভেতরে সোমেন বইয়ের মধ্যে নিমগ্ন হতে থাকে।

খুব ভোরে ঘুম ভাঙে ওর। তখনো সূর্য ওঠে নি। বারান্দায় দাঁড়িয়ে আড়িমুড়ি ভাঙে। ঠাণ্ডা বাতাসের স্পর্শ ঘুমের আমেজ কেড়ে নিয়ে যায়। ও দরজায় তালা লাগিয়ে বেরিয়ে আসে। পাড়ার ছেলেরা প্রগতি পাঠাগারের ভক্ত হয়ে উঠেছে। বিকেলে গোল হয়ে বসে ওদের সঙ্গে হাজারো গল্প করে। ছেলেগুলো উন্মুখ হয়ে শোনে। ওদের আগ্রহ বাড়ে, বই নিয়ে যায়। পড়ে ফেরত আনে, কোথাও না বুঝলে আলোচনা করে। কখনো তুমুল তর্কে মেতে ওঠে। পথে মোমেনের সঙ্গে দেখা।

সোমেনদা ?

আরে মোমেন এত ভোরে কোথায় যাচ্ছিস তুই ?

শিউলি কুড়োতে।

কাল পাঠাগারে আসিস নি যে ?

বাবা জোর করে বাজারে নিয়ে গিয়েছিলো।

আজ আসিস।

অবশ্যই আসবো। না এলে আমার নিজেরই মন খারাপ থাকে। কাল কি আলোচনা হলো ?

বিকেলে কথা বলবো রে। এখন তো সময় নেই।

দু-তিনটে বাড়িতে খবর দিয়ে সোমেন রমনা রেলওয়ে ওয়ার্কশপের গেটের সামনে এসে দাঁড়ায়। তখন শিফট চেঞ্জের সময়। লোহার গেট দিয়ে নাইট শিফটের শ্রমিকরা বেরিয়ে আসছে, বিধ্বস্ত কালিঝুলিমাখা চেহারা। দৃষ্টি দীপ্তিহীন এবং ফ্যাকাশে। এর মাঝে অনেকেই সোমেনকে দেখে হাত ওঠায়। কারখানার চিমনি দিয়ে যেমন গলগলিয়ে ধোঁয়া ওঠে তেমন লোহার গেট দিয়ে মানুষগুলো বেরুচ্ছে, কোনো তফাৎ নেই। তাদের পাশ দিয়ে আসন্ন শিফটের শ্রমিকরা ঢুকছে। এরই মাঝে সোমেন নিজের কাজ করে যায়।

আপনি ইউনিয়নের সভ্য হয়েছেন রহমত ভাই ?

হ্যাঁ।

মকবুল ভাই আপনি ?

আমি গত বছর সভ্য ছিলাম। এ বছর হই নি, হয়ে যাবো।

এই যে আতাহার কেমন আছিস ?

ওর চোখ লাল। মেজাজ খারাপ। কালিমাখা হাত সোমেনের মুখের ওপর নাড়িয়ে বলে, যাবো আর কোন চুলোয়, যাচ্ছি নরকে। চারটে ডালভাত খেয়ে ঘুমুতে হবে তো। শালা রাতের ডিউটি মানুষ করে !

আয় এদিকে আয় কথা বলি ?

সোমেন ওকে একপাশে টেনে নিয়ে যায়। আতাহারের উত্তেজনা কমে না। ও যখন কথা বলে পুরো শরীর ঝাঁকিয়ে বলে। কি বলছে ভেবে-চিন্তে বলে না, আশপাশ দেখেও না।

রাতের ডিউটি মানে সবটাই মাটি। বউটাকে কাছে পাই না। একটা মাত্র ঘর, দিনের বেলা কিছু করার কি জো আছে ? যত্তসব। জীবনটা তেতো হয়ে গেলো।

আতাহার একদলা থুতু ফেলে জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটে। যেন কোনো পানীয়ের অভাবে দীর্ঘকাল ওর ঠোঁট শুকিয়ে আছে। ও প্রাণপণে শুকনো ঠোঁট ভেজাতে চাইছে।

যাই, হাত ছাড়েন সোমেন দা। আপনি মানুষটি বড় ভালো গো।

তাতে লাভটা হলো কি ?

কেন, কেন ?

ও দ্রুত উচ্চারণ করে।

তুই তো ইউনিয়নের সভ্য হলি নে ?

দূর ঐসব ইউনিয়ন ফিউনিয়ন আমার ভালো লাগে না।

তুই বুঝতে পারছিস না আতাহার যে ইউনিয়ন শক্তিশালী না হলে তোরা বাঁচতে পারবি না। তুই কি একা পারবি মালিকের সঙ্গে লড়াই করতে ? ম্যানেজার শুনবে তোদের কথা ? ওরা চুষে তো ছিবড়ে বানিয়ে ফেললো তবু চৈতন্য হচ্ছে না ? আর কবে হবে ? কবরে গেলে ?

ততক্ষণে সোমেনকে ঘিরে বেশ কয়েকজন গোল হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওরা সম্মতিসূচক মাথা নাড়ে। আতাহার মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। সোমেন আরো কিছুক্ষণ বক্তৃতা করে। সকলে সভ্য হবে বলে রাজি হয়। এমনকি আতাহারও। বাকিরা কাজে চলে গেলে সোমেন আতাহারের সঙ্গে বেশ খানিকটা আসে।

শোন আতাহার আমার ঘরটাতো সবসময় খালিই থাকে তুই মাঝে মাঝে দুপুরবেলা বৌকে নিয়ে আমার ঘরে চলে আসবি। আমি তোকে চাবি দিয়ে রাখবো। কেমন ?

ছিঃ ছিঃ সোমেনদা কি যে বলেন। ওতো রাগ ঝাড়ার কথা। আমি কি আপনার ঘরে যেতে পারি !

তাতে কি তুই তো আমার বন্ধু।

আমি আপনার সব কথা শুনবো। আর আমাকে লজ্জা দিবেন না।

আতাহার সোমেনকে ছাড়িয়ে অন্য দিকে চলে যায়। ভীষণ লজ্জায় ও পালিয়েছে। এমনই কি হয় ? মানুষের দুর্বল জায়গায় ভালোবাসার স্পর্শ দিলে মানুষ পাল্টে যায় ? আতাহারের চলে যাওয়া সোমেনের ভীষণ ভালো লাগে। ওকে আর দেখা যাচ্ছে না। ও দালানের আড়ালে চলে গেছে। ওকে নিয়ে একটা গল্প লেখা যায়। মজার অভিজ্ঞতা হলো আজ, ছোট কিন্তু দারুণ।

সোমেন মনে মনে হাসে। বাড়ির পথে আর যাওয়া হয় না। রেলওয়ে ইয়ার্ডের ওপর বসে অন্যদের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দেয়।

বিকেলে ইউনুসকে ধরে নিয়ে আসে নিজের ঘরে। কিছুক্ষণ আগে ও ডিউটি থেকে ফিরেছে। সোমেন ওর জন্যে গেটেই দাঁড়িয়েছিলো। তাগড়া চেহারা, লম্বা মানুষটাকে কখনো হঠাৎ করে দেখলে ভয় লাগে,

অনেকেই এমন কথা বলে। কিন্তু সোমেন ওর হৃদয় চেনে, সেখানে একটা গোপন কুঠুরি আছে, সেই কুঠুরিতে রাত-দিন ভালোবাসার আলো জ্বলে। অথচ সবাই ওকে ভুল বোঝে। কেননা সন্ধ্যার আঁধার নামতেই শুরু করবে মাতলামি। তখন ওর সামনে কোনো দেয়াল থাকে না। ও ভিন্ন মানুষ হয়ে যায়। তবে সোমেনের ভীষণ ভক্ত। ও কিছু বললে না করতে পারে না।

কি জন্যে ডাকলেন বাবু ?

কালোনীর মধ্যে তুই বড্ড বেশি হল্লা করিস রে ইউনুস ?

কেউ নালিশ করেছে বুঝি ?

নালিশ করবে কেন আমি বুঝি দেখি না। আর কার ঘরে না যাই ? কার খোঁজ না রাখি ?

তাতো ঠিক। নেশা না করলে যে শরীরে যুত পাই না। সব অন্ধকার হয়ে যায়। দম আটকে আসে।

ঠিক আছে এখন থেকে তুই আমার সামনে আমার ঘরে বসে খাবি।

ইউনুস নোংরা দাঁত বের করে হাসে।

তা কি হয় বাবু ? শাসনের মধ্যে কি নেশা হয় ?

হবে না কেন ? আমি লিখবো আর তুই বসে বসে খাবি। আমার একটুও অসুবিধে হবে না ?

ইউনুস চুপ করে থাকে।

তুই ইউনিয়নের এত ভালো কর্মী, আর তোর জন্যেই আমাকে সবচেয়ে বেশি কথা শুনতে হয়। আমার লজ্জা লাগে না বুঝি ?

ইউনুস মাটির দিকে তাকিয়ে থাকে। উস্‌খুস করে. পালাতে পারলে বাঁচে। নেশা করতে না দিলে ও সবকিছু ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যাবে এখান থেকে। সোমেন ওর মনোভাব আঁচ করে।

ঠিক আছে নেশার কথা থাক। তুই বৌ মারিস কেন ?

নেশা করলে কিছু যে মনে থাকে না।

ইস ঐ দিন বৌটাকে মেরে তুই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলি আর বেচারা এমন বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছিলো যে আমার বুক কেমন করছিলো। আমাকে দেখে আরো কান্নায় ভেঙে পড়লো।

আপনি গিয়েছিলেন বুঝি আমার ঘরে ?

নইলে বলছি কেন ?

ইউনুস দাঁতে জিভ কাটে।

ছিঃ ছিঃ কি লজ্জা !

তুই তোর বৌ-কে ভালোবাসিস না ইউনুস ?

বাসি তো।

তা হলে গায়ে হাত তুলতে বুকে বাধে না ?

ইউনুস আবার নীরব হয়ে থাকে।

ও তোর ছেলেমেয়েদের মা নয় ?

হ্যাঁ।

ছেলেমেয়েদের সামনে মাকে মারলে ওরা তোকে ঘেন্না করবে না ? দেখিস বড় হয়ে তোর মুখ দেখতে চাইবে না।

খুব ভুল হয়ে গেছে বাবু। আর কখনো এমন করবো না।

সত্যি তো ?

এই আপনার পা ছুঁয়ে বললাম।

ইউনুস সোমেনের পায়ে হাত রাখে।

থাক, থাক হয়েছে।

কিন্তু নেশা ছাড়তে পারবো না বাবু, মেরে ফেললেও না।

ঠিক আছে তা হলে হল্লা করতে পারবি না। রেললাইনের ধারে বসে খাবি।

আচ্ছা।

ইউনুস সম্মতি জানিয়ে চলে যায়।

সোমেন হাত পা ছড়িয়ে বসে। যুদ্ধের ভয়াবহতা ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। বেকারত্ব বাড়ছে, দারিদ্র্য এবং অনাহার চরমে উঠেছে। মানুষ নিজের ভেতর কুঁকড়ে যাচ্ছে। ইউনিয়নের কাজ করা কি যে মুশকিল, ওরা শুধুই ভয় পায়। কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি করতে বুক কাঁপে। সবাই চাকরি যাবার ভয়ে অস্থির। এসব চিন্তা মাথায় ঘুরপাক খেলে সোমেন আরো দ্বিগুণ তেজী হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি ওর বুকের ওপর চেপে বসলে ও প্রবল শক্তি অর্জন করে। কিরণ বলে, তোর মধ্যে হতাশা নেই কেন সোমেন ?

হতাশ হলে নিজেকে পরাজিত মনে হয়। যতক্ষণ শক্তি আছে সংগ্রাম করবো, কিন্তু পরাজিত হতে চাই না।

আমি মাঝে মাঝে নিরাশ হয়ে যাই রে।

সোমেন হাসে। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মার্ট ছাত্র কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত। আধুনিক কবিতা লিখে দারুণ নাম করেছে। আর ও কি না নিরাশায় ভোগে! সোমেন বিড়বিড় করে, আসলে এগুলো এক ধরনের রোগ। এই রোগ ব্যক্তিবিশেষের, কিন্তু অর্থনৈতিক মন্দা গ্রাস করছে সমষ্টিকে।

এর থেকে পরিত্রাণ পেতে হবে। ও গ্লাশে পানি ঢেলে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে মুখ ধুয়ে নেয়। সারাদিনের ঘোরাঘুরিতে মনে হয় জিভে ধুলো জমেছে পুরু হয়ে। কিচ্‌কিচ করছে দাঁতের নিচ। ঘরে অন্ধকার, আলো জ্বালা হয় নি। দরজা দিয়ে সূর্যাস্তের আভা গড়িয়ে পড়েছে। আজ আলো জ্বালা হবে না, কেরোসিন নেই। ভাবছে, বই নিয়ে রাস্তার গ্যাস বাতির নিচে চলে যাবে। নয়টা পর্যন্ত পড়ে এসে ঘুমিয়ে পড়বে। টিন থেকে মুড়ি আর পাটালি বের করে খেতে বসে। ইউনুসের সঙ্গে কথা বলার সময় বুঝতে পারে নি। এখন মনে হয় প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। এমন খিদে কখনো হঠাৎ করে পায়, সবসময় নয়। দু' মুঠ মুড়ি খেতে না খেতে হুড়মুড়িয়ে ভূষণ ঢোকে। উত্তেজনায় হাঁফাচ্ছে।

সোমেন ?
কি রে কি হয়েছে ? এমন করছিস কেন ?
ভূষণ চৌকির ওপর বসে পড়ে। সোমেন পাশে এসে দাঁড়ায়।
সোমেন ?
ভূষণ ওর হাত চেপে ধরে। কথা বলতে পারে না।
কি হয়েছে বলবি তো ?
আমি না মীরাকে জোর করে চুমু খেয়েছি ও ভীষণ রেগে গেছে।
সোমেন হো-হো করে হেসে ওঠে।
তুই হাসছিস !
তুই একটা আস্ত বুদ্ধু।
ও যদি আমার সঙ্গে আর কথা না বলে ? আমার কি হবে সোমেন ?
কিচ্ছু হবে না।
মীরা যা রেগে গেছে—
তুই তো ওকে ভালাবাসিস ভূষণ, ঐ রাগ থাকবে না।
সত্যি বলছিস ?
পাগল একটা, নে মুড়ি খা।
জানিস ভয়ে আমার বুক শুকিয়ে গেছে।
হয়েছে বীরপুরুষ। এতবড় রেল চালিয়ে কত জায়গায় যাচ্ছিস, আর মীরার ড্রাইভার হতে পারবি না বুঝি ?
বড় সুন্দর করে বলেছিস তো ? মীরাকে আমি তোর এই কথাটাই বলবো। বুক থেকে একটা পাথর নেমে গেলো যেন। দে মুড়ি, দে।

ভূষণ এক খাবলা মুড়ি গালে পোরে। সোমেন মুড়ি চিবুতে চিবুতে সিদ্ধান্ত নেয় পার্টির সবার কাছ থেকে চাঁদা তুলে ভূষণের বিয়ের ব্যবস্থাও করবে।

সোমেন বীণাদি তোকে যেতে বলেছে ?

কেন ?

তা জানি না।

ঠিক আছে যাবো একদিন।

না, আজই চল। বীণাদি অপেক্ষা করবে।

খুব জরুরি ?

হবে হয়তো।

দাঁড়া খেয়ে নেই। আর তোর বুকের ধুক্‌পুকানিও কমুক।

আর লজ্জা দিস না। এখন ধুক্‌পুকানি নেই।

ঠিক তো ?

দেখ হাত দিয়ে। তোর কাছে না এলে কি যে খারাপ লাগতো।

তুই আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছিস।

পেটপুরে মুড়ি খেয়ে ঘরে তালা দিয়ে সোমেনকে আবার বেরুতে হলো। বাড়ির সামনের শিউলি ফুল গাছটার নিচে পায়চারি করছিলো বীণা। ছোট্ট বাগান, কিন্তু নানারকম গাছ আছে, এমন কি বিদেশী দুর্লভ গাছও। বাগান বীণার বাবার বিশেষ শখ।

ঘরে বাবা রয়েছে, আমরা এখানে দাঁড়িয়েই কথা বলি সোমেন।

সেই ভালো দিদি, জায়গাটা বেশ খোলামেলা।

সোমেন ভাই আমার, তোমাদের জ্যোতিদাকে একটু বোঝাও না।

কি হয়েছে ?

ওকে চিকিৎসার জন্যে কোলকাতা যেতে রাজী করাও।

সোমেন এবং ভূষণ চুপ করে থাকে।

আমি জানি তোমরা জ্যোতির্ময়কে চেনো, তাই কথা বলছো না। কিন্তু আমি যে এত কষ্ট করে টাকাগুলো জমালাম তাতে কি লাভ হলো ? এর একটা মূল্য ও দেবে না ?

বীণা কেঁদে ফেলে।

বিয়েটা হয়ে গেলেও সেবা-যত্ন দিয়ে আমি ওকে ভালো করে তুলতে পারতাম। ও তাতেও রাজী নয়। বলে আমার দিন তো ফুরিয়েছে তোমার ক্ষতি আমি করতে পারবো না। ও আর নতুন করে কি ক্ষতি করবে, ক্ষতিতো আমার হয়েই গেছে।

সোমেনের কণ্ঠের কাছে কান্নার দলা পাকিয়ে ওঠে। ভূষণ চোখ মুছতে শুরু করেছে। বীণার কান্না থামে না।

দেখো সোমেন ও মরে গেলো, আমি কুমারী থাকবো, সেটা আমি চাই না। বিধবা হলে আমার দুঃখ নেই, তবু তো জানবো জ্যোতির্ময় আমার স্বামী ছিলো।

বীণাদি আমি জ্যোতিদাকে বোঝাবো।

তোমরা যদি না পারো তা হলে আমি ভূষণের এঞ্জিনের তলায় পড়ে মরবো।

বীণাদি ?

ভূষণের আর্তকণ্ঠ বাতাসে চিরে যায়।

ভালোবাসার চাইতে ওর আত্মমর্যাদাই বড় হলো !

তা নয় বীণাদি। আপনি জ্যোতিদাকে ভুল বুঝবেন না যেন। জ্যোতিদা বলেন যে ভালোবাসি বলেই বীণার ক্ষতি করতে পারবো না।

আমাকে মিথ্যে শান্ত্বনা দিও না সোমেন। ও আসলে স্বার্থপরের মতোই আচরণ করছে।

জ্যোতিদা আপনার কথাই ভাবে বীণাদি।

এই ভাবার বোঝায় আমি চাপা পড়ে গেছি, আমার শ্বাস আটকে গেছে।

বীণা আঁচলে চোখ মোছে। কণ্ঠে রাগ প্রকাশ পায়।

তোমরা পারলে একটু বোঝাও ভাই। ইদানীং বাবা আমার সঙ্গে খুব রাগারাগি করছেন। বুঝতে পারো সামাজিকতা আছে, এত বড় মেয়ের বিয়ে দিতে না পারলে কোনো বাপ মা-র কি স্বস্তি থাকে ? আত্মীয়স্বজনও নানা কথা বলে।

কার সঙ্গে কথা বলছিস বীণা ?

ওর বাবা বারান্দায় বেরিয়ে আসে।

সোমেন এসেছে বাবা।

ঐ কমিউনিস্টটা আবার কি চায় ?

আমরা যাই বীণাদি। আপনার কথা জ্যোতিদাকে বলবো।

বাবাকে আর কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে বীণা পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকে যায়। সে রাতে সোমেন ঘুমুতে পারে না। কেবলই কান্না পায়, কেবলই কান্না। বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

এই যুদ্ধকে উপমহাদেশের প্রগতিবাদী শক্তিসমূহ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলে চিহ্নিত করে এতে অংশ গ্রহণ করতে অস্বীকার করায় মার্ক্সবাদীরা কেউ কেউ গ্রেফতার হন, কেউ স্বগৃহে অন্তরীণ হন, আর অনেকে আত্মগোপনে চলে যেতে বাধ্য হন। রেলওয়ে শ্রমিক ইউনিয়নের কাজের গতি শিথিল হয়ে পড়ে। একটা এলোমেলো অবস্থা। সোমেনের দায়িত্ব বেড়ে যায়। ওকে ইস্ট বেঙ্গল রেলওয়ে ইউনিয়নের সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়। রেলওয়ে শ্রমিক ইউনিয়ন এতদিনে বেশ একটা শক্তিশালী সংঘে দাঁড়িয়ে গেছে। তার ওপর রয়েছে প্রগতি লেখক সংঘের কাজ। আনুষ্ঠানিকভাবে সংঘের উদ্বোধন হবে, তার প্রস্তুতি চলছে। কদিন বেশ একটা উত্তেজনা বোধের মধ্য দিয়ে কেটে যায়। গেন্ডারিয়া হাইস্কুল প্রাঙ্গণে সভা। সভাপতিত্ব করেন কাজী আবদুল ওদুদ। অনেক দিন পর একটি ভালো বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হয়ে যায় ও। রাতে ঘরে ফিরে কাজে মন বসে না, বই নাড়াচাড়া করে উঠে পড়ে। জানালার শিক ধরে পেয়ারা গাছের পাতার ফাঁকে দাঁড়িয়ে থাকে। মন বিক্ষিপ্ত। ফেরার পথে একজন প্রবীণ সাহিত্যিক ওকে বেশ খোঁচা দিয়ে কথা বলেছে, সে দংশনের আঘাত এখনো কমে নি, হুল ফুটিয়েই যাচ্ছে। ও বড় একটা রাগে না, কিন্তু রাগলে সেটা কমাতে সময় লাগে।

ভদ্রলোক বলেছিলেন, "কি হে তোমরা নাকি একটা প্রগতি লেখকের দল বেঁধেছ? সাহিত্যের আবার প্রগতি পশ্চাদগতি কি? সাহিত্য রস সৃষ্টি করতে পারলেই তা প্রকৃত সাহিত্য হয়।"

সোমেন খুব বিনয়ের সঙ্গেই বলেছিলো, 'রসবোধ তো সকলের সমান নয়, তাতে যত দ্বন্দ্ব-বিরোধ। সেকালের জমিদারের প্রতাপ, ঐশ্বর্য, শাসন, শোষণ দিয়ে পল্লীগাথা রচিত হতো, একালে পল্লীবাসী প্রজার দারিদ্র্য অন্যায়-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে স্বাধীন প্রচেষ্টার প্রয়াস ফুটিয়ে তুলে সাহিত্য প্রাণবন্ত করে তুলতে হয়। প্রবীণ চায় জমিদারের প্রতিষ্ঠা, আর নবীন চায় জনগণের প্রতিষ্ঠা ও স্বাধীনতা। বুদ্ধিমান কোনো লেখক হয়তো দুই বিবাদমান পক্ষের মধ্যে একটা মধ্যমপন্থার মীমাংসা দিয়ে সাহিত্যে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করতে চাইবেন।"

ভদ্রলোক রেগে উঠলেন, "সেদিনের ছোকড়া তুমি বেশ গালভরা বুলি শিখেছো তো? বলে যাও আমরা যা করেছি সেগুলো ভুল।

আসলে তোমাদের মুখে ঐ এক কমিউনিজমের বুলি। রাশিয়া থেকে আমদানী করা সাহিত্য এদেশে চলবে না। তোমাদের প্রগতি লেখকদের সঙ্গে এইখানেই আমার বিরোধ।”

এ শুধু আপনার মনের কথা। আপনার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা।

হ্যাঁ, তোমাদের ছেঁদো কথায় আমরা ভুলি না। দুনিয়া জুড়ে এই একই বিশ্বাস চলছে যে শিল্পের জন্যেই শিল্প।

সোমেন আর কথা না বাড়িয়ে চলে এসেছিলো প্রবীণ সাহিত্যিক রাগে কাঁপছিলেন। ক্ষমতা থাকলে হয়তো ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেন। পেছন থেকে শুনতে পায় তিনি চিৎকার করে বলছেন, বেশি বাড়লে ভালো হবে না কিন্তু। ও বুঝতে পারছে বেশ একটা বিরোধীশক্তি দানা পাকিয়ে উঠেছে। উঠুক ও ভয় পায় না। আসলে ও বেশি সক্রিয় কর্মী বলে অনেকেই ওকে লক্ষ্যবস্তু ঠিক করে ঢিল ছোঁড়ে। এমন কথাও বলতে শুনেছে যে, সোমেনটাকে বসিয়ে দিলে ওদের কাজকর্ম অনেক কমে যাবে। ঐ ছোঁড়াটা একাই একশো। রাত-দিন খাটতেও পারে। এইসব কথা সোমেন এক কান দিয়ে শোনে, অন্য কান দিয়ে বের করে দেয়। গায়ে মাখে না। ও জানে, কাউকে ওর পরোয়া করার কিছু নেই। কদিন আগে ও ঢাকেশ্বরী মিলে কিংবা নারায়ণগঞ্জ পাটকলে গিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করতে চেয়েছিলো। কিন্তু নেতারা রাজী হন নি। বলেছেন, ওখানে কাজ করার কর্মী আমাদের রয়েছে। পার্টির স্বার্থেই তোমার লেখক সংঘে থাকা অপরিহার্য। ফ্যাসি-বিরোধী গণ-সাহিত্যের মধ্য দিয়ে আমাদের সাংস্কৃতিক পরিবর্তন আনতে হবে। তাই সোমেনের আর যাওয়া হয় নি। আজকে এই মেজাজ খারাপ থাকা মুহূর্তে ওর মনে হয়, এখনো এখানকার নব্বইভাগ লোকের মধ্যে ফ্যাসিবাদের বিষাক্ত চেতনা গলগল বয়। সে দংশন ওদের ক্ষতি করে না, বরং আনন্দ বাড়ায়। এত মানুষের এত ফুসফুসের ফুটো বন্ধ করবে কি দিয়ে? গেঞ্জিটা ঘামে ভিজে জব্‌জব্‌ করছে, সেটা খুলে ফেলে। আস্তে আস্তে মেজাজ থিতিয়ে আসছে। তালপাখা তুলে নিয়ে বাতাস করে। জগ থেকে পানি ঢালে। এক গ্লাশ খাবার পর ওর মনে হয়, জল একটা সাংঘাতিক বস্তু, কখনো ওষুধের কাজ করে। এমন কি মানসিক অসুখও সারিয়ে ফেলে। মনে ফুর্তি ফিরে এলে ও কিছুক্ষণ শিস্‌ বাজায়। হঠাৎ মনে হয় অনেক দিন নির্মল ঘোষকে লেখা হয় নি। তখুনি কাগজ কলমে নিয়ে লিখতে বসে।

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

ক্রীসমাসে আমার কলকাতায় আসবার ইচ্ছা আছে। তখন লিখিত উপন্যাসখানা নিয়ে আসবো, সেটা প্রায় হয়ে এসেছে। আপনি অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন, গ্রাম্য অভিজ্ঞতা আমার প্রচুর—এমন কী যা কেন্দ্র করে শরৎচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে অনেকেই কতগুলো Sweet উপন্যাস রচনা করেছেন, বৈষ্ণবদের সেই আখড়ার সাথেও ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত আমি। কিন্তু সে সব পুরনো হয়ে গেছে, এখন নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর দরকার। বছরখানেক আগে সেই নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর কোন পথই খুঁজে পেতাম না, এখন কতকটা পেয়েছি বলে মনে হচ্ছে।

...আপনি 'বিত্তহীন মধ্যবিত্তদের' নিয়ে লিখতে বলেছেন, এদের ছাড়া আমি আর কাউকে নিয়ে লিখব না জানবেন। আমার বর্তমান উপন্যাস তাঁদেরই নিয়ে। প্লটটি অল্পতে বলি শুনুন ঃ

একটি বন্যা-পীড়িত গ্রাম, সেখানে কোন এক বিত্তহীন মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে মালতী—ঘরে অন্নের চিন্তা, কিন্তু ভয়ানক স্বপ্ন-বিলাসী। তার কথায়, কাজে, প্রতি পদক্ষেপে কেমন একটা শিথিল আর আলসে ভাব। ঘরের বারান্দার নীচে জল দেখে তার আনন্দ হয়। বন্যার সেই নতুন জলে পা ডুবিয়ে সেই জলেই নিজের চেহারা দেখতে তার সুখ; অথচ পেছনে ছোট ভাই-বোন, মা-বাপ, ঠাকুরমা মিলে এক মস্ত সংসার। চেঁচামেচি, দু'হাত মেলে খাবার ভিক্ষার কান্না, এর মাঝেও আমার এই মেয়ে নিশ্চিন্তে স্বপ্ন দেখে। ইতিমধ্যে গ্রামে ফ্লাড রিলিফ কমিটি বসেছে, শুধু চাল দেওয়া এদের রীতি, অর্থ নয়। সেখানকারই রজত নামে এক ছেলে এই সূত্রেই মালতীদের সাথে পরিচিত হলো। মালতীর স্বপ্ন দেখায় সে আঘাত করলো, তার স্বপ্ন ভেঙে দিলো।

এখানে রজতের সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। সে আমার উপন্যাসের নায়ক—ইচ্ছে করেই আমি তাকে (শুধু তাকেই) অস্বাভাবিক করেছি; তার কারণ যা আমি বলতে চাই, তা নইলে আর বলা হয় না। নতুন বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী শুধু এরই ওপর ছায়াপাত করছে।...রজতের Ideology প্রচার করতে গিয়ে অনেকখানেই আমাকে চেপে যেতে হয়েছে। এইখানে একটা কথা আমার বারবার মনে হয়েছে। সেটা এই, দেশে যদি চারদিকে এমনি নাগপাশের বাঁধন না থাকতো অর্থাৎ দেশে যদি ন্যাশনাল গভর্ণমেন্ট থাকতো, তবে আমাদের বিশেষভাবে উপন্যাসে—সাহিত্যের গতি এই যে রুদ্ধ হয়ে এসেছে তার বাঁধন খুলতো। বৃহত্তর চিন্তা আমরা কম করি? মার্কস, হেগেল, কোল, স্ট্রাচি, শ'কী অনে-

কেরই কণ্ঠস্থ নয় ? কিন্তু আমাদের এই দারিদ্রপীড়িত দুঃখক্লিষ্ট জীবনে বৃহত্তর চিন্তাকে মিল খাইয়ে একটু আশার বাণী শোনায় কে ?

ক্যাপিটালিজম আর ইম্পিরিয়ালিজম-এ অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ; প্রথমটির বিরুদ্ধে কোন লেখকের অভিযান করতে হলে দ্বিতীয়টিরও বিরুদ্ধে করতে হয়। সুতরাং বই প্রকাশিত হবার পরদিনই বন্ধ। তখন কী আশা, স্পর্দ্ধা আর সাহস পুঁজি নিয়ে গরীব লেখক আর একখানা উপন্যাসের সূচনা করবে ? কিন্তু মূলে কী, তা কী কেউ জানে না ? জানলেও জানবার সাহস তার কোথায় ? এই বয়সে আমার যতখানি **Intellectual** অনুভূতি আর অভিজ্ঞতা আছে, তার সবখানি আমি নায়ক রজতকে ঢেলে দিয়েছি, কতদূর সফল হলাম কে জানে ?

ইতি—আপনাদের
সোমেন।

চিঠিটা ভাঁজ করে বালিশের নিচে রেখে দেয়। নির্মল ঘোষকে চিঠি লিখতে ভালোলাগে। বেশ আত্মিক যোগাযোগ অনুভব করে। আর চিঠি লিখতে ইচ্ছে করে মা'কে। স্কুলে ক্লাশ নাইনে পড়ার সময় চন্দনা ওকে বেশ কয়েকটা চিঠি লিখেছিলো। ও একটারও উত্তর দেয়নি। বরং একদিন সামনাসামনি ডেকে বলেছিলো, এমন করে চিঠি লিখোনা চন্দনা, তোমার ক্ষতি হবে।

চন্দনা রেগে গিয়ে বলেছিলো, তুমি একটা ভীরু ছেলে। পুরুষ হবার চেষ্টা করো।

আজ হঠাৎ চন্দনার কথা মনে পড়ছে। ওকে চন্দনার ভালো লেগেছিলো কেন ? ভালোলাগা কি চুপিচুপি একদিন মনের কোনে এসে হাজির হয় না কি ভেতরেই জমাট থাকে ? যা সময়ের অনুকূল পরিবেশে মোমের মতো গলতে শুরু করে ? কৈ এতদিনেও ওরতো কাউকেই ভালোলাগলো না। তবে কি ওর ভেতর-বাহির সবটাই ফাঁকা ? ধুত ! এসব কথা ভেবে লাভ নেই। চন্দনার চেহারাও এখন ঝাপসা। মনেপ্রাণে ভাবতে চাইলেও তেমন কোনো কিছু মনে পড়ে না। কত দ্রুত দিন গড়িয়ে যায়। কত দ্রুত দিন ফুরোয়! ওকে নিষেধ করার পরদিনই চন্দনা একটা দীর্ঘ এবং শেষ চিঠি লিখেছিলো। কত অনুরাগের কথা ছিলো ভাবলে এখন হাসি পায়। চন্দনারা এখন কলকাতায়। শুনেছে ওর বিয়ে হয়ে গেছে। এর বেশি ও আর কিছুই জানেনা। কেমন আছে চন্দনা ? সুখি হয়েছে তো ? ওর কথা ভাবতে ভাবতে সোমেনের

ঘুম আসে। চন্দনাকে কেন্দ্র করে ভারি মিষ্টি একটা স্বপ্ন দেখে। সকালে ঘুম ভাঙে সেই স্বপ্নের আমেজে। যেন চন্দনা বলছে, আমিতো তোমার জন্যেই অপেক্ষা করে আছি সোমেন। বাইরে তখন বেলা ওঠে নি। ও চোখ বুজে শুয়ে থাকে। রাত জেগে পড়ে বলে বেশির-ভাগ দিনই একটু বেশি সকালে ঘুম ভাঙে। কিন্তু আজ চন্দনার স্বপ্নে ঘুম ভেঙে গেলে আর ঘুম এলো না। স্বপ্নের আমেজ ভালোলাগছে। ঘুমের ভেতর কেমন একটা অস্থির ভাব। বালিশে মুখ গুঁজে উপুড় হয়ে পড়ে থাকে। যেন ওর জন্যে বিশ্বসংসার চলা বন্ধ করে থমকে দাঁড়িয়েছে। সোমেন তো এমন করে না! সোমেন তো এমন নয়! সবাই জানে সোমেন বড় বেশি কাজের ছেলে। আজই প্রথম নিজের জন্যে খুব মায়া হলো ওর, সঙ্গে সঙ্গে নিজের জন্যে খুব কষ্টও।

ঘুম থেকে উঠতেই ইউনুস এসে হাজির।

কি রে কি খবর? বাড়ির সবাই ভালো তো?

হ্যাঁ, ভালো। জানেন বাবু কাল সাহেব আমাকে কি বললো?

কি?

বললো ইউনিয়ন ছেড়ে দাও। নইলে মুসকিল হবে কিন্তু।

তুই কি বললি?

আমি বললাম আমার ইচ্ছে আমি ইউনিয়ন করবো সাহেব। তুমিতো এমনিতেই আমাকে মেরে রেখেছো, নতুন করে আর কি মারবে? ঠিক বলিনি?

একদম ঠিক। এমন সাহস করেই সবসময় বলবি।

ইউনুস খুশি হয়ে চলে যায়। সোমেন হাতমুখ ধুয়ে নেয়। জ্যোতির্ময়ের ওখানে যেতে হবে। ওয়ারীতে থাকে। ঐখানে কাজ সেরে সরলানন্দের বাসায় যাবে আজকের সভার আয়োজন করতে। ভূষণের ছোট ভাইটি রুটি আর গুড় নিয়ে এসেছে। চটপট খেয়ে ফেলে। বেলা আটটা, রোদ বাড়ছে চড়চড়িয়ে। কলোনীর ছেলেমেয়েগুলো খেলছে। ওদের স্কুল নেই, ওরা স্কুলে যায় না। খেলতে খেলতে বয়স বাড়ে ওদের। তারপর কৈশোর পেরুতে না পেরুতে জোয়াল কাঁধে নেয়। সংসারের ঘানিতে ঢুকে পড়ে, ঘানি টানতে টানতে বুড়ো হয়। এইসব অনাগত মানুষের জীবনের সুন্দর আকাঙ্ক্ষাইতো ওর স্বপ্ন। শেড-ঘর পেরিয়ে খানিকটা এগোতেই একটি দৃশ্য ওকে রাগিয়ে দেয়। স্টেশন মাস্টার একজন কুলিকে বেদম পেটাচ্ছে। বাকি কুলিরা, পয়েন্ট-সম্যান, গানার এবং আরো অনেকে দূরে দাঁড়িয়ে দেখছে। এগিয়ে গিয়ে

ধরার সাহস কারো নেই। সাহেব যখন ওকে বুট দিয়ে চেপে ধরলো তখন সোমেন গিয়ে কলার চেপে ধরে।

ব্লাডি, বাস্টার্ড।

সাহেব থতমত খেয়ে থেমে যায়। তারপর এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়। ততক্ষণে সোমেন ধমাধম ঘুষি দিয়ে দিয়েছে। পরিস্থিতি বুঝে আশেপাশের সবাই এগিয়ে আসে।

এই মুহূর্তে ওর চিকিৎসার ব্যবস্থা করো এবং ক্ষতিপূরণ দাও।

সাহেব দাঁত কিড়মিড় করে তাকিয়ে থাকে।

ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে রেলের চাকা বন্ধ হয়ে যাবে।

সোমেন হাত নেড়ে কথা বলে। পেছন থেকে ওর সমর্থনে গুঞ্জন ওঠে।

ওকে এখুনি হাসপাতালে পাঠাও সাহেব।

ও চোর। স্টোর থেকে—

একটা কথা বলবেনা। আগে ব্যবস্থা নাও। ও যদি অন্যায় করে তার জন্যে বিচার আছে। আইন তোমার হাতে উঠবে কেন ?

তখন কুলিটি চেঁচিয়ে ওঠে, আমি কিছু করিনি বাবু ? সাহেব মিছেমিছি এমন করছে, সাহেবের জুতো খুলে দেইনি বলে।

সোমেন ওর কথায় কান না দিয়ে সাহেবের মুখোমুখি দাঁড়ায়। ক্রোধের ভাষা ওর দৃষ্টিতে, প্রতিবাদ শরীরে। ও এখন অন্য মানুষ। সাহেবের কথা জড়িয়ে যায়। দ্রুত বলে, ঠিক আছে আমি অফিসে গিয়ে জমাদার পাঠাচ্ছি।

তা হবে না, তুমি দাঁড়াও। ঐ সুখেন জমাদারকে ডেকে নিয়ে আয়।

সাহেব বিব্রত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ঘামছে। এই ছেলেটিকে ওরা ভয়ের চোখে দেখে। ওর দৃঢ়তা এবং সারল্য উপেক্ষা করা যায়না। চারদিকে শ্রমিকরা যেমন ঘিরে আছে এক পা এগুলেই বুঝি টুঁটি চেপে ধরবে। শেষপর্যন্ত জমাদারকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে রেহাই পেলো সাহেব। লজ্জায় অপমানে চেহারা বেগুনি হয়ে গেছে।

ঠিক আছে আমিও দেখে নেবো। তোমার অনেক সাহস বেড়েছে।

সাহেব চলে যেতেই শ্রমিকরা ঘিরে ধরে সোমেনকে।

আপনার কোনো ভয় নেই সোমেনদা।

ভয়, কিসের ভয় ?

আমরা আছি আপনার পাশে। আপনি এমন করেই আমাদের কথা সবসময় বলবেন।

তখন সোমেন উপস্থিত সবার সামনে একটা বক্তৃতা করে ফেলে। ইউনিয়নের প্রসঙ্গ না এনে একতা এবং ঐক্যের কথা বলে। উপস্থিত শ্রমিকরা আজকের ঘটনায় নিজেদের ঐক্যের তীব্রতা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে। জমাদার কুলিটিকে নিয়ে গেলে সবাই যে যার কাজে যায়। সোমেন রোদে হেঁটে জ্যোতির্ময়ের বাসায় আসে। ঘরের দরজা খোলা। তক্তপোশের ওপর জ্যোতির্ময় পা ঝুলিয়ে বসে আছে। চেহারা আরো কাহিল হয়ে গেছে। কোটরগত চোখের ছায়ায় সূর্যাস্তের ম্রিয়মান আলো। সোমেনের বুক মুচড়ে ওঠে।

কি খবর সোমেন ?

আপনি কেমন আছেন জানতে এলাম।

বোস।

সোমেন চেয়ারে বসে। চারদিকে বই ছড়ানো। এলোমেলো বিশৃঙ্খল ঘর। টেবিলের ওপর ওষুধের শিশিতে ভরা। সোমেন চুপ করে থাকে। কি বলবে বুঝতে পারে না। জ্যোতির্ময়কে এমন অবস্থায় দেখবে ভাবতে পারেনি। মনে মনে বীণার ভালোবাসার তুলনা খুঁজে পায় না। এই মানুষটির মঙ্গলের জন্যে বীণা নিজের জীবন পণ করেছে। তবু কি শেষ রক্ষা হবে ?

জ্যোতিদা আপনার শরীর এত খারাপ হয়েছে জানতে পারিনি ?

আমার পথতো একটা সোমেন, ক্রমাগত নিচের দিকে নামবে, বাঁক বদলের সময় নেই।

আপনাকে কলকাতায় যেতে হবে।

সোমেন জোরের সঙ্গে বলে।

বীণা পাঠিয়েছে বুঝি তোমাকে ?

না, আমি নিজেই বলছি।

পাগলামী কোরোনা। কাজকর্ম কেমন হচ্ছে ?

আপনি না রেলওয়ে শ্রমিক ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতাদের একজন জ্যোতিদা ?

তাতে কি ?

আপনারা না থাকলে কাজ কি ভালো হয়।

একজনের জন্যে কাজ বসে থাকলে সেটা অন্যের ব্যর্থতা। তুমি কি চাও সে ব্যর্থতার গ্লানি ঘাড়ে নিতে ?

জ্যোতির্ময়ের দৃঢ় কণ্ঠে সোমেনের মাথা হেঁট হয়ে যায়। জ্যোতির্ময় প্রবলবেগে কাশে। কাশতে কাশতে কেমন হয়ে যায়। সোমেন ধরতে গেলে চিৎকার করে।

এসো না, কাছে এসো না।

রাগি, একগুঁয়ে, তেজি ষাঁড়টি এখন বিশাল গর্তের মধ্য থেকে চিৎকার করছে। সে চিৎকার অসহায় এবং অবোধের গোঙানি। বুক ফেটে যায়, কান্না আসে।

একসময় কাশির তোড় কমে আসে।

এই সময় বীণাদি কাছে থাকলে—

স্বার্থপরের মতো কথা ব'লোনা সোমেন। মানুষকে নরকে ঠেলে দেয়ার শিক্ষা তোমাদের নয়।

জ্যোতিদা আমি চাই আপনি ভালো হয়ে উঠুন।

চিকিৎসাতো হচ্ছে।

আরো ভালো চিকিৎসা দরকার।

না, সে পরিমাণ অর্থ আমার নেই।

বীণাদি এসবের মধ্যেই আপনাকে চায়।

তা হয়না সোমেন।

সোমেন এর বেশি কিছু বলার সাহস পায়না। কেমন করে বলবে? ক্ষেপে গেলেতো অসুস্থ মানুষটির কষ্ট বাড়ে।

পার্টি থেকে আপনাকে যদি কলকাতায় পাঠানো হয়?

পার্টির তেমন ফান্ড নেই। তাছাড়া তুমিতো জানো সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মিত্র বাহিনীকে সমর্থন করার কারণে আমাদের ওপর সরকারের আক্রোশ কত প্রবল। নেতারা কেউ জেলে, কেউ আত্মগোপনে। তোমাদের অনেক কাজ, তোমরা আমাকে নিয়ে ভেবো না।

আপনি এভাবে মরবেন?

আহ্, সোমেন বারবার একটা কথা বলছো কেন?

সোমেন ভীষন দমে যায়। জ্যোতির্ময়ের জেদ এবং অহংকার দু'টোই সমান প্রবল।

এর সামনে কথা বলে টেকা মুসকিল।

বিশু কৈ জ্যোতিদা?

বাজারে গেছে, এসে পড়বে এক্ষুনি।

আমি যাই।

এসো।

রাস্তায় নেমে সোমেন ঝাঁঝালো রোদেও সবটা কেমন ঝাপসা দেখে। চোখে কি জল? না কি ধুলো পড়েছে? ও হাতের উল্টো পিঠে চোখ মুছে নেয়। রেল লাইনের ওপর দিয়ে দ্রুতবেগে হাঁটে। পায়ে বিদ্যা-

সাগরী চটি, গায়ে ধূসর রঙের জামা আর কালো প্যাণ্ট। আস্তে আস্তে ইউনিয়নের কাজের পরিধি বাড়ছে। নারায়ণগঞ্জ থেকে বাহাদুরাবাদ ঘাট, জগন্নাথঘাট এবং ভৈরব স্টেশন পর্যন্ত দৌড়াদৌড়ি করতে হয়। কখন কোথায় যেতে হয় কিছু ঠিক থাকে না। শ্রমিকদের সঙ্গে কাজ করা যে কত জটিল! ওদের মধ্যে অসংখ্য স্তর ভেদ এবং তাদের সমস্যা হাজারো রকমের। ইদানীং বেশীরভাগ সমস্যাই ওর আয়ত্তের মধ্যে এসেছে। মিশতেও ভালোলাগে। ওদের জীবন থেকেই লেখার উপাদান পাচ্ছে। এটাতো সত্যি বর্তমান সমাজের সবচেয়ে বঞ্চিত এবং সবচেয়ে প্রগতিশীল বিপ্লবী শক্তি শ্রমিকশ্রেণীর জীবনের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে যুক্ত হতে না পারলে, বৈপ্লবিক পরিবর্তনের কাজে সক্রিয় অংশ না নিলে কোনো সত্যিকার গণসাহিত্য সৃষ্টি করা সম্ভব না। নতুন অভিজ্ঞতার জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকে সোমেন। মধ্যবিত্ত সৃষ্টি করবে, উপাদান হবে ওরা। আচ্ছন্নের মতো ভূষণের বাসার সামনে এসে দাঁড়ায়। প্রচন্ড খিদেয় মাথা ঝিমঝিম করছে। ধূলিধূসরিত পা, বুকে পিঠে দরদরিয়ে ঘাম নামছে। ভূষণের মা উঠোনে বসে ঘুঁটে দিচ্ছিলেন, ওকে দেখে এগিয়ে আসেন।

হাতমুখ ধুয়ে নাও বাবা আমি আসছি, এই হয়ে গেলো।

তিনি হাতের বাকি কাজ শেষ করেন। কাঁচা গোবরের গন্ধ সারা-বাড়িতে ছড়ানো। ভূষণের ছোট ভাইবোনগুলো সকালবেলা গোবর কুড়িয়ে আনে। ওর মা কখনো দেয়ালে সেঁটে কিংবা কাঠির গায়ে মুড়িয়ে জ্বালানির উপযোগি করে।

সোমেন বারান্দায় উঠে বসে। উমা পিঁড়ি পেতে দেয়। ভাতের থালা, জলের গ্লাস নিয়ে আসে। ও এক মুহূর্ত দেরি করেনা। উমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসে।

আজ ভীষণ খিদে পেয়েছে।

বুঝতে পেরেছি।

উমার হাসিতে কি যেন আছে বলে হঠাৎ করে ওর মনে হয়। চটুল এবং রহস্যময়. দেখতে দেখতে উমা বড় হয়ে গেলো। যেমন শারীরিক আয়তনে বেড়েছে তেমন মানসিক দিকেও। এখন ও সোমেনের কাছা-কাছি হতে চায়। একটুপরই ভূষণের মা এসে সামনে বসে।

খুব খিদে পেয়েছে বুঝি বাবা ?

হ্যাঁ মাসীমা। অনেক হেঁটেছিতো।

দাদা বলে আপনি নাকি হাঁটেন না, দৌড়ান।

উমা খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে।

আহ্, উমা, এখান থেকে যা।

সোমেনদার খাওয়া দেখছিলাম মা। মাগো কেমন গপ্‌গপিয়ে যে খায়।

উমার হাসি থামে না। সোমেনও হাসে।

সুযোগ পেয়ে ও আমাকে বোকা বানাচ্ছে মাসীমা।

ওর কথায় কিছু মনে কোরোনা বাবা।

সোমেন এই প্রসঙ্গ এড়িয়ে যায়। ভাত নাড়তে নাড়তে বলে ভূষণের বিয়ে দেবেন না মাসীমা ?

মীরাদির সঙ্গে বুঝি ?

আহ্, উমা তুই এখান থেকে যাবি ?

মা'র ধমক খেয়ে উমা চলে যায়।

ভূষণ কিছু বলেছে বুঝি ?

না, ও কিছু বলেনি।

তাহলে ওরটা এখন থাক। তুমি উমার জন্যে একটা ছেলে দেখো বাবা।

ভূষণেরও তা বয়স হলো—

ও পুরুষ মানুষ। ওরটা একটু দেরিতে হলেও ক্ষতি নেই। উমাকে আগে পার করতে হবে।

সোমেন আর কথা বলে না। ভেবেচিন্তে এগুতে হবে। নিম্ন মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্তের সমস্যাই এমন। ঘরের বয়স্থা মেয়েকে আগে পার করতে হবে। মাসীমা রাজি না হলে ভূষণের জন্য কষ্ট হবে। ভেবেছিলো টাকাপয়সার একটা ব্যবস্থা করতে পারলে সমস্যার সমাধান হবে। এখন দেখছে সমস্যাটা আরো একটু গভীরে। খেয়েদেয়ে উঠে পড়ে ও। আজ সরলানন্দের বাসায় সভা। একটু তাড়াতাড়ি যেতে হবে। ও যা নোংরা করে রাখে ঘরদোর। মাসীমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরুতেই বাড়ির পেছন দিকের কলাঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে উমা।

সোমেন দা ?

কিছু বলবে ?

দাদার বিয়ের কথা ভাবছেন, নিজেরটা ভাবেন না ?

ভাবিতো ?

কৌতুকে সোমেনের চোখ নাচে।

কোথায় ঠিক করলেন ?

করিনি, করবো। ভাবছি চল্লিশ পেরিয়ে নেই।

তার তো এখনো বিশ বছর বাকি !

তুমি কি করে জানলে ?

আপনিতো দাদার বয়সী।

ও তাইতো। তুমি বেশ হিসেবি মেয়ে।

আপনি বুঝি মীরার কথা খুব ভাবেন ?

নাতো, একটুও না।

তবে যে বিয়ের কথা বললেন ?

সে তো ভূষণের জন্যে।

ও।

উমা একটুক্ষণ চুপ করে থাকে।

যাই।

সোমেন ইতস্তত করে পা বাড়ায়।

আচ্ছা সোমেনদা আপনি আমার কথা ভাবেন না ?

মাসীমা বলেছেন পাত্র দেখতে। এখন থেকে ভাববো।

ছাই।

উমা বুড়ো আঙুল দেখায়।

ঘরে যাও উমা।

সোমেন ওকে আর কথা বলার সুযোগ না দিয়ে চলে আসে। ও বুঝতে পারে কলাগাছের আড়ালে উমা দাঁড়িয়ে আছে। ওর হাসি পায়। যৌবনের উন্মাদনায় উমা বাঁধ ভাঙতে চাইছে। ও সুদিনের স্বপ্নে বিভোর।

সরলানন্দের নারিন্দার বাসায় যখন আসে তখন বেলা তিনটে। সরলানন্দ কেবল বাইরে থেকে ফিরেছে। সোমেনকে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

এসেছিস ? বাঁচলাম।

তাতো বাঁচবি, নইলে তোর ঘরের ময়লা সাফ করবে কে ?

উঃ সোমেন খোঁচা দিস না। জানিসইতো আমি এমন এলোমেলো।

হ্যাঁ সন্ন্যাসী থেকে গৃহী হয়েছিস এলোমেলো থাকবিনা !

সরলানন্দ হা-হা করে হাসে।

সেই সব কথা আর মনে করিয়ে দিসনা।

সরলানন্দের চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিলো। তারপর একসময় সন্ন্যাসী হয়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। দীর্ঘ ইতিহাস আছে ওর জীবনের। ঢাকায় ফিরে মার্কসবাদী চিন্তাধারায় আকৃষ্ট হয়ে গৃহী হয়। ও চীনের গণবিপ্লবের আখ্যান লিখতে শুরু করেছে। 'মাও সে-তুং চ্যুতে পেংতে হুয়েই'-এর জীবনীকার হিসেবে বেশ নাম করেছে। প্রগতি লেখক সংঘের সভায় ও দু'একটা লেখা পড়ে শুনিয়েছে। বেশ ঝরঝরে গদ্য, পাঠকের মনোযোগ টেনে ধরে রাখে।

তোর লেখা কেমন এগুচ্ছে সরলা ?

ভালোই। মাস দু'য়েকের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে।

সোমেন ঝাঁটা দিয়ে জঞ্জাল পরিষ্কার করে। ছেঁড়া কাগজের টুকরো, সিগারেটের খালি প্যাকেট, দিয়াশলাইয়ের কাঠি, লেবুর খোসা, মাছের কাঁটা কত কি যে জড়ো হয়েছে ইয়ত্তা নেই। সোমেন নাকে গামছা বেঁধে ঘর ঝাড়ু দেয়। ধুলোয় ওর চুল শাদা হয়ে যায়। ঝাড়ু দিয়ে শতরঞ্চি বিছিয়ে দেয়।

বাহ্, চমৎকার ছিমছাম হয়েছে।

ঘুষি দিয়ে নাক উড়িয়ে দেবো একদম। আবার প্রশংসা করা হচ্ছে।

সরলানন্দ হেসে গড়িয়ে পড়ে।

আবার দাঁত বের করা হচ্ছে।

সোমেন গজ্‌গজ করতে করতে ঘরের পেছনে গিয়ে বালতি থেকে পানি নিয়ে হাতমুখ ধুয়ে নেয়। একে একে সবাই আসতে শুরু করেছে। সোমেন এর মধ্যে কাপ পিরিচগুলো ধুয়ে নেয়। স্টোভ জ্বালিয়ে চায়ের পানি বসিয়ে দিয়েছে। আপাতত প্রাথমিক পর্ব শেষ। সবাই এসে পড়লে আলোচনা শুরু হবে। প্রগতি লেখক সংঘ নিছক সাহিত্যিক-আড্ডা নয়। দেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে একটি সুস্পষ্ট পথে পরিচালনা করাও ছিলো এর লক্ষ্য। প্রতিক্রিয়াশীল বড় বড় সাহিত্যিক-দের মাঝে একটা নতুন সাহিত্যচক্র দাঁড় করানোই ছিলো উদ্দেশ্য। প্রথমেই অচ্যুত গোস্বামী এসে ঢুকলো। এর সঙ্গে সোমেনের আলাপ ছিলোনা।

সরলানন্দ আলাপ করিয়ে দেয়।

এই আমাদের সোমেন, বড় কাজের ছেলে।

হ্যাঁ, ওঁর কথাতো শুনেছি। ওঁর 'সংকেত' গল্পটি পড়েছি। আপনি লেবার ফ্রন্টে আছেন ?

সোমেন লাজুক হেসে বলে, হ্যাঁ। নেতারা কি সহজে নিতে চান? কত ওজোর আপত্তি! আমার স্বাস্থ্য খারাপ এত পরিশ্রম সইতে পারবো না ইত্যাদি ইত্যাদি। আমিও না-ছোড়। প্রলেটারিয়েট পার্টির শক্তির উৎস। এ যুগের রাজনৈতিক পালাবদলে প্রোলেটারিয়েটের ভূমিকাই অগ্রণী। তাদের মধ্যে যদি কাজ করতে না পারলাম, তবে, শৌখিন কমিউনিস্ট বলে নাম কিনে লাভ কি?'

সারাদিন কাজ করার পর আপনি এত লেখেন কখন, আপনিতো দেখছি অসাধারণ লোক।

সোমেন লজ্জিত ভাবে বলে, কিন্তু সারাদিন রেলওয়ে শ্রমিকদের মধ্যে না থাকলে আমি আজকাল লিখতে পারি না।

খুব ভালো লাগলো আপনার কথা শুনে। মন ভরে গেলো। এমন কথা কারো কাছে শুনিনি। তবে স্বাস্থ্য আপনার সত্যি সত্যি খারাপ। তাছাড়া স্বভাবের দিক থেকে আপনি সাহিত্যিক।

অসহিষ্ণুভাবে সোমেন বলে ওঠে, স্বভাবটভাব বুঝি না। রেভুল্যু-শনের সময় আমি ভ্যানগার্ডে থাকতে চাই।

অচ্যুত গোস্বামী একটু অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

এইসময় এ'কে দু'য়ে বাকিরা এসে পড়ে। সোমেন আজ ওর 'দাংগা' গল্পটি পড়বে। ক'দিন আগে শহরে ভীষণ দাঙ্গা হয়ে গেছে। বৈশাখের কাঠফাটা রোদে ঘুরে ঘুরে ও কাজ করেছে। সেই অভিজ্ঞতার পট-ভূমিতে গল্প। এখানকার সবারই লক্ষ্য আছে সাহিত্য যেন প্রচার হয়ে না যায়, শিল্প ক্ষুণ্ণ না হয়। সে কারণেই লেখা নিয়ে চুলচেরা সমা-লোচনা হয়। কেউ ছেড়ে কথা বলে না। সোমেন ভয়ে ভয়ে ওর গল্প পড়তে শুরু করলো। প্রথমে সবাই হাসি হাসি মুখ নিয়ে গল্প শুনতে শুরু করে। দু'একজন নীচুস্বরে আলাপও করে। কিন্তু আস্তে আস্তে ঘরের আবহাওয়া গুমোট হয়ে যায়। সোমেনের মুখের ওপর সকলের একাগ্র দৃষ্টি। ছোট্ট গল্পটি শেষ হলে সকলে থ হয়ে থাকে। সমালোচক-চূড়ামণি রণেশ দাসগুপ্ত পর্যন্ত চুপ থেকে বলে, 'নাহ, সর্বাঙ্গ সুন্দর গল্প।' অচ্যুত গোস্বামী বলেন, "গল্পটি মূলত সাবজেক্টিভ বলে সহজেই উপদেশাত্মক বা উদ্দেশ্যমূলক হয়ে ওঠেনি; অথচ লেখকের অসাম্প্রদায়িক উদার দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।' সবাই ছোট-খাটো মন্তব্য করে। সোমেনের মনে হয় বাঘের মুখ থেকে ও ছাড়া

পেলো। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ও চা বানাতে চলে যায়। গল্পের বিষয়বস্তু এখন সবার মুখে মুখে ফিরছে। সেখানে সোমেনের কোনো উপস্থিতি নেই। ওর অত্যন্ত ভালোলাগছে যে গল্পটি ওকে বাদ দিয়ে একাই পাঠকের হৃদয়ে পেঁৗছেছে। সৃষ্টি স্রষ্টাকে অতিক্রম করেছে। চা ছাঁকতে ছাঁকতে ওর মনে হয় জীবনের সবটাই যদি এমন বড় পাওয়া হতো ?

চা খাওয়ার পর রণেশ প্রস্তাব করলো, কলকাতা থেকে 'প্রগতি লেখক সংঘ'-এর উদ্যোগে 'প্রগতি' নামে যে সংকলন গ্রন্থটি বেরিয়েছে আমরাও সে রকম একটি গ্রন্থ প্রকাশ করতে চাই।

হ্যাঁ, তা করা যায়।

সবাই সায় দেয়।

'প্রগতি' সম্পাদনা করেছে কে ?

সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ও হীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী সভায় আমি বইটির কপি নিয়ে আসবো।

আমার একটা প্রস্তাব আছে।

কি ?

সকলে উৎসুক হয়ে রণেশের মুখের দিকে চায়।

শুধুমাত্র ঢাকা জেলার 'প্রগতি লেখক সংঘ'-এর লেখকরাই এই সংকলনে লিখবেন।

ঠিক, তাই হবে।

সবাই একবাক্যে সায় দেয়।

বইটি প্রকাশের দায়িত্ব থাকলো সোমেনের ওপর।

গুরুদায়িত্ব—

সোমেন মাথা চুলকে বলে। অমৃত ওর মাথায় একটা চাটি মেরে বলে, তোর মাথায় সব দায়িত্বই সয়। রণেশ খুশির তোড়ে বলে, সোমেন আর এক রাউন্ড চা হয়ে যাক।

কিরণ বলে, সংকলনের নাম হবে কি ?

অনেক ভেবেচিন্তে রণেশ বলে, ক্রান্তি।

কেউ আপত্তি করে না। কে কি লিখবে সেটা নির্ধারণ হতে থাকে।

সভা শেষে ফেরার পথে বীণার বাসায় যায় ও। আজ ওর বাবা বাসায় ছিলোনা। শিউলিতলা অন্ধকার। খোলা দরজায় ক্ষীণ আলোর

রেখা বারান্দায় পড়েছে, বাগান পর্যন্ত সেটা পেঁছেনা। ঘরে বীণা ছোট ভাইবোনগুলোকে পড়াচ্ছে। সোমেন সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে ডাকে, বীণাদি ? এক ডাকেই বীণা দ্রুত বেরিয়ে আসে।

কি খবর সোমেন ?

বীণাদি জ্যোতিদা'র শরীর খুব খারাপ।

বীণার চোয়াল শক্ত হয়ে যায়। চুপ করে থাকে। সোমেন একটা ঢোক গিলে বলে, এই অবস্থায় জ্যোতিদাকে আপনার কথা কিছুতেই বলতে পারলাম না। আমি বলতে পারবোনা বীণাদি।

কোনো উত্তরের অপেক্ষা না করে ও দ্রুত রাস্তায় নেমে আসে। পেছন ফিরে দেখতে পারে না যে বীণা দাঁড়িয়ে আছে, না ভেতরে ঢুকেছে। কেবলই মনে হয় একজোড়া ব্যথাতুর দৃষ্টি ওর পিঠের ওপর লেপ্টে আছে। কোনো কিছু দিয়ে ঘষেও সেই দাগ ওঠানো যাবেনা।

ঘরে ফিরতেই দেখে ভূষণ ওর ঘরের সামনে পায়চারি করছে। হাতে ভাতের বাটি।

আর একটু দেরি করে এলেই চলে যেতাম। রাতে উপোস করে মরতি।

সোমেন দরজা খুলতে খুলতে হাসে।

তুই চাইলেও আমাকে মারতে পারবিনা।

হ্যাঁ, এইসব বিশ্বাস নিয়েই থাক।

ঘরে ঢুকবি না কি বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকবি ?

জানিস সোমেন মা আজ ইলিশ রান্না করেছে। কতদিন পর বলতো ?

এইতো সেদিন খেলাম।

যাহ্ মিথ্যা বলিস না।

সোমেন একটু চুপ করে থেকে অন্য প্রসঙ্গে যায়। একটু উচ্ছল হয়ে বলে, ভাবছি মাসীমাকে আর কত কষ্ট দেবো, এখন থেকে তোর বউর হাতের রান্না খাবো।

ভূষণ কথা বলেনা। সোমেনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। সোমেন পায়চারি করে। তারপর ভূষণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গম্ভীর হয়ে বলে, ভূষণ আমি ঠিক করেছি চাঁদা তুলে মীরার সঙ্গে তোর বিয়েটা সেরে ফেলবো। তুই কি বলিস ?

ভূষণ চুপ করে থেকে বলে।

সে পরে হবে। তুই এখন ভাত খা।

তোর সম্মতিটা জানা ?

চাঁদা তুলে কেমন দেখায় না ?

আমাদের বন্ধুরা দেবে, আমরা আনন্দ করবো। দোষের কি ?

তুই যা ভালো বুঝিস।

মাসীমাকে জিজ্ঞেস করতে হবে না ?

মা রাজি হবেনা সোমেন।

ভূষণের কণ্ঠ থম ধরে যায়। সোমেনও চুপ করে থাকে। ভূষণ গামছা থেকে ভাতের বাটিটা খোলে। ইলিশের গন্ধ ছড়িয়ে যায় ঘরে। সরষে বাটা ইলিশ কবে খেয়েছে মনে পড়েনা সোমেনের। ইলিশের কথায় ও নস্টালজিক হয়ে যায়।

ইলিশের কথা উঠলেই মা'র কথা মনে পড়ে।

তুই খেয়ে নে সোমেন আমি বসি।

সোমেন থালা গ্লাস ধুয়ে নিয়ে বসে।

উমার একটা বিয়ে দেয়া যায়না সোমেন ? ওর বিয়েটাই জরুরী।

ওর জন্যে আমি রঞ্জনের কথা ভাবছি।

রঞ্জন ? মন্দ হবেনা। ও রাজি হবে তো ?

আমি রাজি করাতে পারবো।

উহু, সোমেন তুই আমার প্রাণের বন্ধু রে।

ভূষণ চলে গেলে শ্রমিকদের পাঁচটা দরখাস্ত লিখে রাখে। সকালে কাগজগুলো দিয়ে গেছে। একটা বিড়ি ধরিয়ে যুৎ করে টানে। মন আজ পরিপূর্ণ। গল্পটা সবাই ভালো বলেছে, এই আনন্দ দিগন্তস্পর্শী। পেটপুরে ইলিশ দিয়ে ভাত খেয়েছে, এই আনন্দ আকাশের সমান। সোমেনের মনে হয় জগৎ-সংসারের সবকিছু আজ আনন্দময়। আজ সাহেব ওর সামনে নতি স্বীকার করেছে।

ও খাতা টেনে লিখতে বসে। কতদিন আগে 'ইঁদুর' গল্পটা শুরু করেছিলো, আর ধরা হয়নি। সেই খাতাটা টেনে বের করে। বাকি অংশ লিখতে লিখতে ও নিজের অস্থিমজ্জায় জড়িয়ে যায়। গল্পের নায়ক সুকুমারের সঙ্গে কোনো তফাৎ থাকেনা, দু'জনে অভিন্ন, এক সত্তায় বিলীন।

১৯৪১-এর ২২ জুন হিটলার সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণ করে। জার্মানীর ফ্যাসিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী সামরিক বাহিনী প্রায় সমগ্র পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপ দখল করার পর মনে করে এদের শক্তি হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নকে শায়েস্তা করার। সাম্রাজ্যবাদের কাঠামো ভেঙে বেরিয়ে আসার শাস্তিতো তাকে পেতেই হবে। এই নতুন রাষ্ট্র যে মানুষের সাম্যের অধিকারে বিশ্বাসী। ফলে ফ্যাসীবাদী হিটলারের জার্মানী, ফ্যাসীবাদী মুসোলিনীর ইটালি এবং ফ্যাসিবাদী জাপানের সামরিক অভিযানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা প্রগতিবাদীদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। কেননা সোভিয়েতের জয়লাভ একান্তই জরুরী।

আস্তে আস্তে যুদ্ধ ঘোরতর রূপ নেয়। বছর শেষ হবার আগেই চীনের একটা বিরাট অংশ দখলকারী জাপান হিটলারের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে ইন্দোচীন ও বার্মাকে দখল করে সমগ্র এশিয়াকে মুঠোয় নিতে উদ্যত হয়।

প্রগতি লেখক সংঘের লেখকরা ঢাকায় 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি' গঠন করে। সম্পাদক হয় দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আর কিরণশংকর সেনগুপ্ত। সমিতি সোভিয়েত চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। দায়িত্ব পড়ে সোমেনের ওপর। রাতদিন পরিশ্রম করে প্রদর্শনীর কাজ গুছিয়ে ফেলে ও। ডিসেম্বর মাসে ঢাকা ব্যাপটিস্ট মিশন হলে এক সপ্তাহব্যাপী চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন হয়। নাম দেয়া হয় 'সোভিয়েত মেলা'। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। সোমেনের কাজের বিরাম নেই। প্রতিদিন শত শত লোক আসে প্রদর্শনী দেখতে। সোমেন ওদেরকে চিত্রের পরিচয় দেয়। আরো অনেকেই দেয়, কিন্তু ওর ঢঙটা একটু ভিন্ন। ও যখন গল্প বলার ভঙ্গিতে লেনিনের দেশের কথা বলে লোকজন উৎসুক হয়ে শোনে। ওর চারদিকে ভিড় জমে যায়। লোকে নানা ধরণের প্রশ্ন করে। ও হাসিমুখে জবাব দেয়, বোঝাতে চেষ্টা করে। এই যুদ্ধ সাধারণ মানুষের কি ক্ষতি করেছে তার স্বরূপ ব্যাখ্যা করে। ওর নিজেরও নেশার মতো লাগে ব্যাপারটা। কিভাবে যে সময় ফুরিয়ে যায় বুঝতে পারে না। সোমেনের মনে হয় স্বপ্নের ঘোরে সাতদিন চলে গেলো।

আমাদের এই প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে কিরণ।

সোমেনের উত্তেজিত চেহারায় আলো ঠিকরে পড়ে। প্রশস্ত কপাল, ফর্সা গাল গৌরবর্ণ হয়ে যায়।

হ্যাঁ, আমিও তাই ভাবছি।

কিরণ জোরের সঙ্গে বলে।

এ'কদিনেই বুঝেছি সাধারণ মানুষের জানার প্রচণ্ড আগ্রহ আছে। আমরা সার্বিক পথ দেখাতে না পারলে সেটা আমাদের ভুল হবে।

মানবসভ্যতার এই ঘৃণ্যতম শত্রুদের স্বরূপ চিনিয়ে দিতে হবে আমাদেরই।

তুই 'ক্রান্তি' নিয়ে কবে কলকাতা যাচ্ছিস ?

পরশু।

ভালোই হবে।

বিশজন লেখকের লেখা নিয়ে ১৬০ পৃষ্ঠার 'ক্রান্তি' বেরিয়েছে বেশ কিছুদিন আগেই। ওর 'বনস্পতি' গল্প এখানে ছাপা হয়েছে। 'ইঁদুর' গল্পটাও শেষ করে এনেছে, আর অল্প একটু বাকি। ঘরে ফিরে কাজ করতে পারেনা ও। অস্থিরতা জাপটে ধরে রাখে। অনবরত পায়চারি করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সবচেয়ে ভয়াবহ নির্মম নিষ্ঠুরতা চলছে সোভিয়েতের মাটিতে। স্তালিনগ্রাদের উপকণ্ঠে সোভিয়েতের প্রচণ্ড প্রতিরোধের মুখে ফ্যাসিস্ট শক্তির অগ্রগতি স্তব্ধ হয়ে গেছে। ভারত-বর্ষে তার প্রতিক্রিয়া দ্বিধা বিভক্ত। ঢাকা শহরের এক অখ্যাত এলাকায় হ্যারিকেনের টিমটিমে আলোয় সোমেন তার 'ইঁদুর' গল্প লিখছে। শেষটা এভাবে করে, "কয়েকদিন পর কোনো গভীর প্রত্যুষে একটি ইঁদুর মারা কল হাতে করে আমার বাবা রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে বোকার মতো হাসতে লাগলেন। দারুণ খুশীতে নারু আর মন্টুও তাঁর দুই আঙ্গুল ধরে বানরের মতো লাফাচ্ছিলো। কয়েক মিনিট পরে আরও অনেক ছেলেপেলে এসে জুটলো। একটা কুকুর দাঁড়ালো এসে পাশে। উপস্থিত ছেলেদের দলে যারা সাহসী তারা কেউ লাঠি, কেউ বড়বড় ইঁট নিয়ে বসলো রাস্তার ধারে।

ব্যাপার আর কিছুই নয়, কয়েকটা ইঁদুর ধরা পড়েছে।"

গল্পটা 'পরিচয়' পত্রিকায় দিয়ে আসবে ছাপার জন্য। এই লেখাটা লিখে ও দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে উঠেছে। কব্জীতে জোর পাচ্ছে, মনে হয় নিজের ওপর আস্থা বাড়ছে। কখনো নিজের ওপর ভালোবাসা জন্মায়না, আজ তেমন একটা অনুভূতি ওকে পাগল করে রাখে। যেদিন 'ক্রান্তি' বেরুলো সেদিনও এমন একটা অনুভূতি হয়েছিলো। মনে হচ্ছিলো জীবনের সবদিকে দখিনা দুয়ার খোলা।

কলকাতায় গিয়ে সোমেনের একদম ভিন্ন অনুভূতি হয়। 'ক্রান্তি'র লেখকরা এত উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পাবে ও নিজেও ভাবতে পারেনি। ঢাকায় এমন প্রগতিশীল লেখক রয়েছেন আমরাতো জানতাম না ? অনেকেই উচ্ছ্বসিত হয়ে এই কথা বারবার বলেছেন। কখনো এত উচ্ছ্বাসেও বিব্রত হয়েছে। লাজুক হাসি ছাড়া আর কিছু করতে পারেনি। আনন্দে অহংকারে বুক ফুলে উঠছিলো বারবার। 'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদক বললেন 'তোমার গল্পটি চমৎকার। সামনের সংখ্যায় ছেপে দেবো।' সোমেন নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। বারবারই মনে হয় যেন উড়তে উড়তে ঢাকায় চলে যায়। রণেশকে বুকে জড়িয়ে বলে, রণেশরে আমরা অনেক কিছুই পারি। মফস্বলে আছি বলে আমরা খাটো হয়ে যাইনি।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় বললেন, তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুব খুশি হলাম। অল্পকিছু দিনের মধ্যেই ঢাকায় যাবো তোমাদের দেখতে।

কেউ কেউ বললেন, সাহিত্যে প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী কি রকম হওয়া উচিত এবং সৃজনশীল রচনায় তার প্রকাশই বা কী ধরনের হতে পারে তার একটি দৃষ্টান্ত 'ক্রান্তি'র তরুণ লেখকরা তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন।

ক'দিন কলকাতায় ঘুরে ফিরে বেশ চাঙ্গা হয়ে ঢাকায় ফিরে আসে সোমেন। সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে ক্লান্ত লাগছিলো, চুপচাপ শুয়েছিলো। বারবার মনে হচ্ছিলো চা পেলে ভালো হতো, কিন্তু উপায় নেই। অন্তত ভূষণের বাসা পর্যন্ত হেঁটে যেতে হবে। তার চেয়ে শুয়ে থাকাই ভালো। এ'কদিন ঘরে তালা ছিলো, ঝাঁট। পড়েনি, খোলা পথে বাতাস চলাচল করেনি, কেমন একটা ভ্যাপসা গন্ধে শরীর ঘুলিয়ে উঠছে। তবু জোর করে শুয়ে থাকে ও।

রঞ্জন এসে ঢোকে।

সোমেন দা ? কবে এলেন ?

আজই।

এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম। দরজা খোলা দেখে ভাবলাম দেখে যাই আপনি এসেছেন কি না ?

বোস।

রঞ্জন মোড়া টেনে বসে।

কেমন কাটালেন ?

ভালো, খুব ভালো। তোমাদের কারখানার খবর কি ?

চলছে আগের মতোই। আপনি কিছু খেয়েছেন ?

না। চা পেলে ভালো হতো।

ঠিক আছে আমি আনছি।

কিভাবে ?

গ্লাস নিয়ে যাই। স্টেশনের স্টল থেকে আনতে আনতে ঠাণ্ডা হবে না। ভূষণদাকে খবর দিয়ে যাবো ?

যেও।

সোমেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। শীতের রাত সন্ধ্যাতেই বুড়িয়ে যায়। লোক চলাচল থাকে না বলে ঝিম ধরে থাকে। সোমেনের ভালো লাগেনা। হৈ চৈ কলরব না থাকলে ও যোশ পায়না। মানুষের উপস্থিতি ওকে তাতিয়ে রাখে। আগামীকাল ভৈরব যাবে মিটিং করতে। ইউনুসকে নেবে সঙ্গে। ওকে খবর দেয়া দরকার। উত্তুরে বাতাসের দাপট সংচালো হয়ে উঠলে ও উঠে জানালা বন্ধ করে।

তখন ভূষণ আসে।

সোমেন ?

হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে ও।

কি হয়েছে ভূষণ ?

বীণাদি নেই।

কি বলছিস ?

সোমেন দু'হাতে ভূষণের কাঁধ খামচে ধরে। ভূষণ ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

রঞ্জন আমাকে কিছু বললো না ?

ওকে বলতে বারণ করেছিলাম।

কি হয়েছিলো বীণাদির ?

রেলের নিচে আত্মহত্যা করেছে।

উঃ মাগো।

টুকরো টুকরো হয়ে গেছে শরীর।

সোমেন দু'হাতে চুল খামচে ধরে রাখে। হাঁটুর উপর মাথা। পা কাঁপছে ঠক্‌ঠক্‌ করে।

জ্যোতিদা জানে ?

হ্যাঁ।

কবে ঘটলো ?

তুই যাবার পরদিনই।

দু'জনে চুপচাপ বসে থাকে, শোকার্ত, বিষন্ন। কারো কোন অনুভূতি নেই। যেন বাইরে প্রচন্ড তুষারপাত, বেরুবার পথ নেই। ভূষণের

ফোঁপানি থেমে গেছে। সোমেন নিঃশব্দে কাঁদছে। চোখের জলে গায়ের চাদর ভিজে যায়। হঠাৎ সোমেন ছিটকে ওঠে।

ভূষণ তুই কি সেদিন ড্রাইভার ছিলি ?

না, সোমেন, না। ভগবান আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

ভূষণ দু'হাতে মুখ ঢাকে। সোমেনের চোখ লাল, বীণাদের বাগানের রক্তজবার চাইতেও লাল। রঞ্জন চায়ের গ্লাস হাতে ফিরে আসে। কেউ কথা বলে না। হাতে চা ঠান্ডা হতে থাকে।

সোমেনদা আপনি চা খেতে চেয়েছিলেন ?

সোমেন কথা বলে না। রঞ্জন বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। হঠাৎ সোমেন উঠে ওর পাশে এসে দাঁড়ায়।

রঞ্জন তোমাকে আমি উমার সঙ্গে বিয়ের ব্যাপারে কিছু কথা বলেছিলাম।

হ্যাঁ।

আমি চাই কাজটা এই সপ্তাহে যে কোনো দিন শুভক্ষণ দেখে হয়ে যাক।

আমার তো তেমন কেউ নেই সোমেনদা। আপনি যেভাবে বলবেন সেভাবে হবে। আমি আপনাকে দাদার চেয়ে বেশি মনে করি। চা'টা খান।

দাও।

সোমেন এই সময়—

তুই চুপ কর ভূষণ।

রঞ্জন তুমি এখন যাও। আমি ভৈরব থেকে এসে সবকিছু গুছিয়ে ফেলবো।

রঞ্জন চলে যায়। ভূষণ বিস্মিত হয়।

ব্যাপার কি বলতো ?

আমি চাই মীরার সঙ্গে তোর বিয়েটা তাড়াতাড়ি হয়ে যাক।

আমাকে নিয়ে তোর কোনো ভয় নেই।

ভূষণ দৃঢ়তার সঙ্গে বলে।

তোকে নিয়ে ভয় নেই। কিন্তু বয়স্থা মেয়ে ঘরে থাকলে বাবা মা'র ঘুম থাকেনা।

ভূষণ চুপ করে থাকে। স্টেশনে ট্রেন এসে থেমেছে।

আমি সেই জায়গাটায় যাবো ভূষণ ?

এখন ?

হ্যাঁ, এখনই। বাইরেতো জ্যোৎস্না অসুবিধে হবে না।

চল, এমন রাতেই আমরা বীণাদির কাছে যাই।

ভূষণ দীর্ঘশ্বাস ফেলে। সোমেন ওর বিদ্যাসাগরী চটি পরে নেয়। রেললাইনের উপর দিয়ে ওরা যখন হাঁটে তখন গুঁড়িগুঁড়ি কুয়াশা মাথার ওপর ঝরে। সামনে ধোঁয়াটে দেখায়। অভ্যস্ত পথ তবুও কখনো হোঁচট খায় সোমেন। ভূষণ ওর হাত ধরে। দু'জনে ভারাক্রান্ত, মুখে কথা নেই, আর একটু এগুলেই সেই ভয়াবহ জায়গা, নির্জন, হিমশীতল। সেখানে পেঁীছে লাইনের ওপর বসে পড়ে সোমেন।

ভৈরব থেকে ফিরলেই রঞ্জনের সঙ্গে উমার বিয়ে হয়ে যায়। ভূষণের মা ভীষণ খুশি। সোমেনকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করেন। ভূষণের পক্ষে এত তাড়াতাড়ি বিয়ের আয়োজন করা সম্ভব ছিলোনা।

বাবা তুমি যে আমার কত বড় উপকার করলে !

একথা বলছেন কেন মাসীমা, আমার ছোট বোন থাকলে আমি করতাম না !

তাতো ঠিকই বাবা।

এবার ভূষণের বিয়েটা দিয়ে ফেলুন।

তিনটে মাস সময় লাগবে বাবা। টাকা পয়সা গুছিয়ে নিতে হবেতো।

সে আমি দেখবো মাসীমা। আপনার ভাবতে হবেনা।

দেখ তুমি যা ভালো বোঝ।

সোমেন নিশ্চিন্ত হয়ে যায়। ভূষণও খুশি।

এখন তুই মীরাকে যত খুশি চুমু খেতে পারিস। ও আর রাগ করবেনা।

ধুত। শালা !

ভূষণ ভীষণ লজ্জা পায়। সেদিনের ঘটনা ওকে যেমন রোমাঞ্চিত করে, তেমন নিজের বোকামীতে রাগও হয়। এরপর কতবার মীরাকে চুমু খেয়েছে সে খবর তো সোমেন আর জানেনা। সোমেনকে বলা যায় না। মীরা এখন ভালোবাসার গভীরতায় নিমজ্জিত। বিয়ে না হলে মীরাও বীণার মতো মরবে। ও অন্য ড্রাইভারের কাছে যাবেনা। ভূষণের এঞ্জিনের নীচেই মাথা পাতবে। ভাবতেই ভূষণের বুক ধড়ফড় করে ওঠে।

দু'দিন পর ভিক্টোরিয়া পার্কের সবুজ ঘাসের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে থাকে ও। প্রগতি লেখক সংঘের সান্ধ্য আসর বসেছিলো এখানে। ফ্যাসিস্ট বিরোধী আলোচনা সভা আয়োজনের তোড়জোড় চলছে। রণেশের ওপর দায়িত্ব পড়েছে। ঠিক করা হয়েছে কিছু লিফলেটও ছাড়া হবে। সভা শেষে সবাই চলে গেছে। শুধু সরলানন্দ বসে আছে। সোমেন যেতে চায়নি বলে ওর যাওয়া হয়নি। মাও-সে-তুং-এর ওপর ওর লেখাটা বেশ প্রশংসা পাচ্ছে। ঘাস চিবুতে চিবুতে সরলানন্দ বলে, বাড়ি যাবি না সোমেন ?

আচ্ছা সরলা, বীণাদি মরলো কেন ?

জানিনা।

বেঁচে থাকা কি বীণাদির জন্য এতই কষ্টের ছিলো ?

জানিনা।

ভালোবাসা কি মানুষকে এমন পাগল করে দেয় ?

জানিনা।

কেবল জানিনা, জানিনা। শুয়োর কোথাকার।

সোমেন দাঁতমুখ খিঁচিয়ে চিৎকার করে। সরলানন্দ বিস্মিত হয়ে যায়। স্বল্পভাষী সহিষ্ণু সোমেন এমন অসহিষ্ণুর মতো আচরণ করছে কেন ?

তোর কি হয়েছে সোমেন ?

কিছুনা।

ও ঠাণ্ডা, ম্রিয়মান কণ্ঠে বলে। দপ্ করে নিভে যায় ওর ক্ষোভ। বাইরে যত কাজই করুক, ওর অন্তরটা বীণার ঘটনায় তোলপাড়। বুকের ভেতর একটা টগবগে ভাব অনবরত বুদ্বুদ তোলে। পুড়ে যায় শিরা-উপশিরা। হঠাৎ সোমেন উঠে বসে।

সরলা চল জ্যোতিদার ওখানে যাই ?

না।

কেন ?

আমার রাগ হয়।

থাক, তাহলে।

ও আবার শুয়ে পড়ে।

ভূষণের বিয়ের জন্যে কিছু চাঁদা ওঠাতে হবে।

আছি, তোর সঙ্গে। কি করতে হবে বলিস।

রঞ্জনের বিয়েটা ভালোই হয়েছে। শ্রমিকরা যা খাটা-খাটনি করেছে না! ওদের আন্তরিকতার তুলনা হয়না। ওদের সহযোগিতার মনো-ভাবটা একদম আলাদা, মধ্যবিত্তের চাইতে অন্যরকম।

সরলানন্দ হো-হো করে হেসে ওঠে।

মধ্যবিত্ত? ওদের চাইতে সুবিধাবাদী আর কি কেউ আছে?

কিন্তু সাংস্কৃতিক বিপ্লবটা মধ্যবিত্তের হাতেই ঘটবে।

সরলানন্দ চুপ করে থাকে। আকাশে গোল চাঁদ। কারোই বাড়ি ফেরার তাগাদা নেই।

শ্রমিকরা তোকে খুব ভালোবাসে রে সোমেন।

তা বাসে।

তুই সাবধানে থাকিস। ফরওয়ার্ড ব্লকের ছেলেরা তোর বিরুদ্ধে নানা কথা বলছে। ওরা সুযোগের অপেক্ষায় আছে। সুযোগ পেলে ছাড়বেনা।

বাদ দে ওসব কথা। যার হারাবার কিছুই নেই, তার আর ভয় কি রে?

কথাটা ঠিক বললিনা। সর্বহারাদের জন্যে তোর যে ভালোবাসা এটাই তোর বড় সম্পদ। এটাকেই বিরোধী পক্ষ ভয় করে বেশি। ওরা জানে তোকে সরিয়ে দিতে পারলে ওরা অনেকটা নিশ্চিত। তোর জনপ্রিয়তা এখন ওদের সবচেয়ে বড় শত্রু। ফরওয়ার্ড ব্লকের ছেলেরা হুমকিও দিচ্ছে।

সোমেন চুপ করে থাকে। এসব কথা ও জানে। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ কেন ওকে সমীহ করে তা ও বোঝে। শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে, ওদের ভাবনার গিঁটগুলো খুলে যাচ্ছে এই সাফল্যে ও আপ্লুত। ওর বিশ্বাস সেদিন বেশি দূরে নয় যেদিন সর্বহারাদের বিপ্লবে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্ম হবে। মুছে যাবে ভেদাভেদ। ওর মনে হয় ওর ঘুম পাচ্ছে, ও এখন নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারে। ঘাসের মতো প্রাকৃতিক শয্যায় একটা চমৎকার প্রশান্তির ঘুম। সোমেন চোখ বোঁজে। কেউ ডাকলে ও এখন কিছুতেই সাড়া দেবেনা। ওর সামনে থেকে মুছে গেছে সরলানন্দ, পার্কের গাছ-গাছালি। মুছে যাচ্ছে তারা-ভরা আকাশ। ঘুমের জন্যে ওর কখনোই তাগাদা ছিলোনা, অনেক রাত ও না ঘুমিয়ে কাটিয়েছে। আজ ওর বুকে ঘুমের জন্য প্রচণ্ড ব্যাকুলতা। সবুজ ঘাসের শীতল স্পর্শে ওর চোখ জড়িয়ে আসে।

সোমেন ঘুমুলি? বাড়ি ফিরবিনা?

না। এখানেই থাকবো।

ও যেন অবচেতনে কথা বলে। ওর চৈতন্যে শব্দ নেই। ও আজ ভীষণ একা, নির্জন নিঃসঙ্গতায় পৃথিবীর প্রথম মানুষ।

সোভিয়েত 'সুহৃদ সমিতি'র উদ্যোগে ফ্যাসিবিরোধী সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে, ৮ মার্চ ১৯৪২। স্থান সূত্রাপুরের সেবাশ্রম অঙ্গন। কলকাতা থেকে বঙ্কিম মুখার্জি ও স্নেহাংশু আচার্য সম্মেলনে সভাপতি ও প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদানের জন্যে ঢাকায় আসেন। জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে দলে দলে কর্মীরা সম্মেলনে উপস্থিত হতে থাকে। সম্মেলন বানচাল করার জন্যে আর. এস. পি. এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের কর্মীরা তৎপর। অনেকেই প্যাণ্ডেলের ভেতর ঢুকে পড়েছে। হাতে ধারালো অস্ত্র।

এই সম্মেলন বানচাল করার জন্যে প্রতিক্রিয়াশীল চক্র ওঁৎ পেতে ছিলো। ভেতরে ভেতরে ওদের প্রস্তুতি ছিলো বেশ, শুধু সময় এবং সুযোগের অপেক্ষা। তাছাড়া রেলওয়ে শ্রমিক ইউনিয়নকে কেন্দ্র করে সোমেনের উপর আক্রোশ ছিলো তীব্র। ওদের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও সেবাশ্রম অঙ্গন লোকে লোকারণ্য। এ এক অসাধারণ প্রাণের জোয়ার। একটা সময় আসে যখন কাউকে ডাকতে হয় না, পথ দেখাতে হয় না, সকলেই আপন নিয়মে চলে, এখন তেমন সময়। সোমেনের মনে হয় এ সৃষ্টিশীল সময় একটা বিশাল, মহৎ শিল্পকর্মের মতো। যে লেখা ও চেষ্টা করে লিখতে পারে না এখন যেন তেমন একটা লেখা তৈরি হয়েছে। ও আবেগে বিচূর্ণ হয়। স্থির থাকতে পারে না। শত শত কর্মী দলবদ্ধ অবস্থায় আসছে। ও অল্প কয়েকজন শ্রমিক নিয়ে ইউনিয়ন অফিসে বসে আছে। বাকিরা তুমুল হট্টগোলে কথা বলছে। সবাই প্রতিযোগিতা করে কথা বলতে চাইছে। নিজেদের আবেগ প্রকাশ করছে। শুধু সোমেন নিশ্চুপ। ও প্রশান্ত চিত্তে এই বিপুল কর্মকাণ্ড অবলোকন করছে। আজ ওর বড় আনন্দের দিন। যেন সব পাওয়া হয়েছে এমন একটা ভাব নিয়ে গালে হাত দিয়ে বসে থাকে। সৌরীন্দ্র সাইকেল নিয়ে ঢোকে।

মিছিল তো চলে গেছে, তুমি এখানে বসে যে? চলো যাই।

আরও একটু অপেক্ষা করবো সবাই এসে পৌঁছেনি।

তাহলে আমি যাই।

সৌরীন্দ্র বেরিয়ে যায়। একটু পর আবার ফিরে আসে।

অবস্থা খুব ভালো নয়। প্রতিক্রিয়াশীলরা মারমুখী। তুমি একটু সাবধানে এসো। তোমাকে নিয়ে আমাদের ভয় আছে।

সোমেন মৃদু হাসে।

ঘাবড়াবার কিছু নেই। তুমি যাও, আমি আসছি।

হেসে উড়িয়ে দিওনা।

সৌরীন্দ্র গম্ভীর হয়ে বলে। তারপর তড়িঘড়ি বেরিয়ে যায়। ও চলে যেতেই সোমেনের রাগ হয়। অকারণ উপদেশ শুনতে বাজে লাগে। ও অস্থির চিত্তে অপেক্ষা করে। এক্ষুণি না বেরুলে সভা শুরু হয়ে যাবে।

কিন্তু সভা ঠিকমতো শুরু হতে পারলো না। ঢিল ছোঁড়াছুঁড়ি এবং গেটের মুখে মারপিট আরম্ভ হলো। যারা সভা ভঙের উদ্দেশ্যে এসেছিলো, সম্মেলনের স্বেচ্ছাসেবকদের সময় মতো প্রতিরোধে তা সফল হলোনা। উপরন্তু পুলিশের গুলিতে ওদেরই একজন কর্মী সুখেন নিহত হলো। প্রতিহিংসার জন্যে মরীয়া হয়ে উঠলো স্বদেশী ফ্যাসিস্টরা। সুখেনের লাশ নিয়ে সরে পড়লো ওরা। তখন লাল পতাকা হাতে অল্প সংখ্যক শ্রমিক নিয়ে মিছিল করে আসছে সোমেন। লক্ষ্মীবাজার, হৃষিকেষ দাস রোডের মোড়ে এসে পেঁছিলে ছোরা, ভোজালি, লোহার ডাণ্ডা নিয়ে ওদেরই একদল ঝাঁপিয়ে পড়ে সোমেনের ওপর। অতর্কিত আক্রমণে মিছিল ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। অল্পসংখ্যক শ্রমিক নিরুপায় অসহায়। খালি হাতে লড়ার অবস্থা ওদের নয়। প্রতিহিংসায় ক্রুদ্ধ, উন্মত্ত ওরা কুপিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে সোমেনকে।

রাজপথে ছিন্নভিন্ন, রক্তাক্ত পড়ে থাকে সোমেন। চোখের পাতা বন্ধ, ওখানে এখন তীব্র আলোর বিচ্ছুরণ নেই, কম্পন নেই, ঘৃণা নেই। অদূরে ছিটকে পড়েছে ওর প্রিয় লাল পতাকা। সোমেনের চারপাশে মানুষের ভিড়। প্রতিক্রিয়াশীলরা উন্মত্ত জিঘাংসার উল্লাসে চলে গেলে একে দু'য়ে ভিড় করে মানুষ, ওদের চোখে জল।

এদিকে বিরোধী দল সরে পড়ার পর সম্মেলন যখন নতুন করে শুরু হতে যাচ্ছে, তখনই এলো খবর। সোমেনকে মেরে ফেলেছে, সোমেনকে মেরে ফেলেছে, চিৎকার করছে কে ? না, ওটা কারো একক কণ্ঠ নয়, ওটা সমবেত ধ্বনি। সমস্ত লোকালয় অতিক্রম করে সূত্রাপুরের সেবাশ্রম প্রাঙ্গণে আছড়ে পড়ছে। মাইকে রণেশের কন্ঠ মৃত্যুর বার্তা ঘোষণা করছে। মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে যায় সমুদ্রের গর্জন, কিন্তু বড় অল্প সময়ের জন্যে। বড়ই কম সময়। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে কিরণ, অমৃতশিশুর মতো অসহায় এবং নির্বোধ কান্না। কমরেড অজিত মাইকে

চিৎকার করে উঠলেন, আপনারা শিশির বাবুকে আটকান। শিশির বাবু একটা বাঁশ হাতে ছুটে বেরিয়ে যেতে চাইছে। ঠেলাঠেলি করে বেরুতে চাইছে রেলওয়ে শ্রমিকরা, ঢাকেশ্বরী মিলের শ্রমিকরা। তখন বঙ্কিম মুখার্জি জলদ গম্ভীর স্বরে মাইকে বলে উঠলেন, 'আপনারা যাবেন না, বেরোবেন না, প্রতিশোধের পন্থা এটা নয়।' বাইরের গেটে শ্রমিকদের আটকানো হচ্ছিলো, বঙ্কিম বাবুর ঘোষণায় মুহূর্তে দাঁড়িয়ে পড়লেও আকুল আবেদনে ভেঙে পড়ে, যেতে দিন, আমাদের যেতে দিন। সোমেনদা একা মরবে কেন? আমরা তো আছি। বঙ্কিম বাবু ভরাট কণ্ঠে বক্তৃতা করে যাচ্ছেন। তাঁর আবেগ-মথিত কণ্ঠে নিস্তব্ধতা নেমে আসে প্রাঙ্গণে। তিনি মানুষের হৃদয় স্পর্শ করতে পারেন, লোকে তাঁর কথা শোনে, উত্তেজনা কমে আসে। নেমে আসে শোক, প্রতিটি মানুষের বুক এখন শোকার্ত পদাবলীর পংক্তি। সকলের চোখ অশ্রুসজল, সকলের কণ্ঠ নির্বাক, নিস্তব্ধ। প্রাঙ্গণজুড়ে বঙ্কিম বাবুর কণ্ঠ হা-হা ফেরে। সেই বক্তৃতায় পরিস্থিতি কিছুটা আয়ত্তে আসে। নইলে সেদিন ঢাকা শহরে কি ঘটতো কেউ বলতে পারে না।

লাশকাটা ঘরে সোমেনের লাশ। পুরোনো ঘর রক্তে ভরে গেছে, রক্ত এসে জমেছে বাইরের সিঁড়ির ওপর। বাম বাহু এখনো আগের মতোই সুডোল। নিটোল সুপুষ্ট শরীরটা ক্ষতবিক্ষত, বীভৎস। শোকে মোহ্যমান সাথীরা নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকে। জীবনকে সুন্দর করার স্বপ্ন দেখতো সোমেন, তার মৃত্যু হলো প্রচণ্ড নারকীয় বীভৎসতায়।

সরলানন্দ বারবার চোখ মোছে। সেদিন ভিক্টোরিয়া পার্কের সবুজ ঘাসে শুয়ে কত নিশ্চিত, নির্ভার ছিলো সোমেন। এখন ওকে চেনা যায়না, ও একটা কীট হয়েছে। সুন্দরের স্বপ্ন নিয়ে ও একটা পোকা হয়েছে, বিড়বিড় করতে করতে সরলানন্দের বুক ফেটে যায়। ও আর সোমেনের দিকে তাকাতে পারেনা, বাইরে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। ফ্যাসিস্ট নারকীয়তা যে কত চূড়ান্ত পর্যায়ে যেতে পারে সোমেন তার প্রমাণ। সোমেনের জন্য তো লাশকাটা ঘর নয়? সোমেন কেন লাশ-কাটা ঘরে শোবে। সরলানন্দ দুম করে দেয়ালের গায়ে ঘুঁষি মারে।

এভাবেই ছিঁড়ে যায় আমাদের ধমনী, এভাবেই, এভাবেই।

কিরণ কবিতার মতো কথাগুলো উচ্চারন করে সরলানন্দের ঘাড়ে হাত রাখে।

এভাবেই তৈরি হবে রক্তের সমুদ্র।
সরলানন্দ কিরণকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ওঠে।
আমাদের বুকে সোমেনের রক্তের গন্ধ জমে থাকবে।
কিরণ কবিতার মতো প্রলাপ বকে।

দোরগোড়ায় বিশ্বযুদ্ধের তাণ্ডব, জাপানের ভারতবর্ষ আক্রমণের প্রস্তুতি, সোমেনের মৃতদেহ নিয়ে বন্ধুরা শ্মশানে যাচ্ছে। অনেকের সঙ্গে সঙ্গী হয়েছেন বঙ্কিম মুখার্জি ও জ্যোতি বসু। দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে, নিস্তব্ধ সবাই। টপ্‌টপ করে পানি ঝরছে, মুখে শব্দ নেই। সকলের বুক জুড়ে প্রজ্জ্বলিত চিতার আগুন। অমৃত ছুরির ফলা দিয়ে দেয়ালে লিখলো: সোমেন চন্দ: আমাদের প্রিয় সংগ্রামী লেখক।" আস্তে আস্তে নিভে আসে চিতার আগুন। রণেশ বিড়বিড় করে, মাত্র বাইশ, বাইশ বছরে নিঃশেষিত হলো সোমেন। তখন ওর মনে হয় ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ গঠনের ক্ষেত্রে হিটলারের সোভিয়েত আক্রমণ ও জাপানের ভারতবর্ষ আক্রমনের প্রস্তুতি হলো পরোক্ষ প্রেরণা, আর প্রত্যক্ষ প্রেরণা হলো সোমেনের আত্মদান। তাই সোমেন অমর, সোমেনের মৃত্যু নেই। হঠাৎ করেই ডুকরে কেঁদে ওঠে রণেশ এবং একটু পরেই দু'হাত মুঠি করে উপরে তুলে বলে, সোমেন অমর, মৃত্যুহীন সোমেনের প্রাণ। সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীরা গলা মেলায়। নিস্তব্ধ প্রেতপুরী শ্মশান হঠাৎ করেই প্রাণস্পন্দনে আলোড়িত হয়ে যায়। শেষ-কৃত্য সমাধা হয়, ফিরে আসে সবাই। যুদ্ধের দরুণ ব্লাক আউট চলছে, অন্ধকারে মোড়া ঢাকা শহরের রাস্তা, আরো অন্ধকার মানুষের হৃদয়ে, শুধু নক্ষত্রমণ্ডলী জ্বলজ্বল করে মুক্তির ইশারা নিয়ে। রণেশ আচ্ছন্নের মতো পথ চলে। সোমেনকে খুব কাছ থেকে দেখেছে ও। কত ছোটখাটো ঘটনা, আনন্দ-বেদনার সাক্ষী। এত প্রাণবন্ত, কর্মঠ ছেলে কমই জন্মায়। রণেশের বুক খালি হয়ে যায়। বড় কাছের এক প্রিয়জন হারিয়ে গেলো আজ। ও নিজে তো সবসময় মানুষের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে, প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু সোমেনের মতো পেরেছে কি? না, পারেনি। ওর ব্যর্থতা সোমেন আড়াল করে দিয়েছিলো। এখন কে দেবে? প্রতিক্রিয়াশীল চক্র যতদিন থাকবে ততদিনতো মানুষের দিকে হাত বাড়িয়ে রাখতেই হবে কিন্তু একজন সোমেন যে কত সাধনায় তৈরি হয়! একজন সোমেন চাই। রণেশ বিড়বিড় করে। মুখে একটাই লাইন, মাত্র বাইশ, বাইশ বছরে শেষ।

প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্যে একটি সাহিত্যপত্র প্রকাশের ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়া হয়। অল্পকালের মধ্যেই কোর্ট হাউস স্ট্রীট থেকে 'প্রতিরোধ' নাম দিয়ে পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হলো। কিরণ এবং অচ্যুত পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক। কিন্তু প্রতি সংখ্যার সম্পাদকীয় লিখে রণেশ। রাত জেগে পত্রিকার কাজ করতে করতে কখনো ওর ঘুম উবে যায়। মধ্যরাতে বারান্দায় বসে থাকে। চারদিকে সোমেনের স্মৃতি বড় বেশি আষ্টেপৃষ্টে জড়ানো। রণেশ কখনো বিড়বিড় করে, তোকে আমি নতুনের মধ্যে ছড়িয়ে দেবো। তোকে আমি মরতে দেবোনা সোমেন। তোর সব দায়িত্ব এখন থেকে আমার। অন্ধকারে রণেশের সিগারেট জ্বলে। মগজে আলোর রেখা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আরো কত, কতজনকে নিয়ে আসতে হবে এই সারিতে। কেউ আসবে স্বেচ্ছায়, কাউকে আনতে হবে বুঝিয়ে। এভাবেই তৈরি হয় কর্মী। জাগে নতুন প্রাণ, নতুন সাড়া। রণেশ নিজের ভেতরের উদ্দীপনায় উৎসাহিত হয়ে ওঠে। সোমেনের মৃত্যু ওকে ভিন্ন অভিধায় নিষিক্ত করেছে। ও এখন আর পিছু হটার কথা ভাবে না, চলা, এগিয়ে চলা। এখন থেকে কেবলই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে রাখা, কেবলই সবুজের উপাসনা। রণেশ সিগারেট শেষ করে ঘরে ফিরে টেবিলে বসে। সামনে 'প্রতিরোধ'-এর জন্য সম্পাদকীয় রচনা। এক প্যারা লিখে উঠে গিয়েছিলো। এটা এখন আর পছন্দ হয় না। কাগজটা দলা করে ছুঁড়ে মারে বাইরে। আবার নতুন করে শুরু করে। কাগজের ওপর ঝুঁকে থাকে রণেশের মাথা, ও লিখছে। দ্রুত চলছে কলম। বাইরে মধ্য রাত। আকাশের বুকে ফুটে আছে তারা।

এই সময় কমিউনিস্ট পার্টির ওপর থেকে বিধিনিষেধ প্রত্যাহৃত হওয়ায় পার্টি অফিসও সারাক্ষণ সরগরম থাকে। আন্দামান প্রত্যাগত সদ্যমুক্ত রাজবন্দীরা প্রায় সকলেই এসে উঠেছেন পার্টির কার্যালয়ে। তাঁদের দেখতে ভিড় করে কর্মীরা। কোর্ট হাউস স্ট্রীটে পার্টির অফিস। 'প্রতিরোধ' পত্রিকা প্রকাশিত হবার পর থেকেই অনেক তরুণ লেখক পত্রিকা অফিসে নিয়মিত আসে। অনেকে প্রগতি লেখক সংঘের সভায় তাঁদের রচনাদি পাঠ করে, আলোচনায় অংশ নেয়। রণেশের বুক ভরে

যায়। সোমেন নেই কিন্তু তাঁর উত্তরাধিকারীরা সোমেনের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে। যারা নবীন লেখক তারা সবাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র, মেধায় শাণিত, তারুণ্যে দীপ্ত। ওদের যুক্তি এবং আবেগ হৃদয় স্পর্শ করে। গণবিপ্লবের ধারায় শিল্পসম্মত গল্প লেখার অন্যতম প্রবর্তক হিসেবে সোমেনের নাম ওদের মুখে মুখে। সোমেনের মৃত্যুর পর 'পরিচয়' পত্রিকায় 'ইঁদুর' গল্পটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সুধী মহলে সাড়া পড়ে যায়।

আড্ডায় মুনীর চৌধুরী সবচেয়ে সরব। সে সবে একটা দু'টো গল্প লেখা শুরু করেছে। 'ইঁদুর' গল্পের ওপর দীর্ঘ আলোচনা করে বলে, বক্তব্য কিভাবে শিল্পে রূপায়িত হয়ে যায় এই গল্পটি তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

সরদার ফজলুল করিম প্রস্তাব করে, আমরা সোমেন-স্মৃতি সংখ্যা 'প্রতিরোধ' প্রকাশ করবো।

সবাই একবাক্যে সায় দেয়।

রণেশ বলে, সোমেনের লেখার শিল্পরূপের ধারাকে সামনে এগিয়ে যাবার শপথই আমাদের সবচেয়ে বড় কর্তব্য। তাহলেই সোমেনের স্মৃতি চির জাগরূক থাকবে।

সৈয়দ নূরুদ্দিন বক্তৃতার ঢঙে বলে, একটি দীপ নির্বাপিত হয়েছে বলেই শত দীপের শিখা এবার প্রজ্বলিত হবে।

ঠিক হয় ডিসেম্বর মাসে 'নিখিল বঙ্গ ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সম্মেলন' হবে। প্রতিদিনই ২০ নং কোর্ট হাউস স্ট্রীট জমজমাট থাকে। তরুণদের উপস্থিতি বদলে দেয় ঘরের আবহাওয়া। সোমেন ছিলো চুপচাপ শান্ত, এরা প্রগলভ, তুমুল তর্কে মাতে, ঘর ফাটিয়ে হাসে। এদের জীবনীশক্তি অন্যরকম।

আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আই. এস-সি. পাশ করে ফিরে এসেছে মুনীর চৌধুরী। চালচলনই আলাদা, পাথরের বোতাম লাগানো শেরওয়ানিতে তাঁকে ভিন্ন জগতের বাসিন্দা মনে হয়। পান আর সিগারেট খায় প্রচুর। সেইরকম ছিলো তাঁর পড়াশোনার গভীরতা। সমসাময়িককালের তরুণরা তার মতো অধ্যয়নে পারঙ্গম ছিলো না। আড্ডায় ছিলো মধ্যমণি। বাবা সরকারের বড় চাকুরে, তাতে কোনো বাধা নেই, সে মার্ক্সীয় ভাবাদর্শে দারুণভাবে অনুপ্রাণিত। বিশেষ করে সোমেনের স্মরণ-উৎসব এঁদের গেঁথে ছিলো মালার মতো। সরদার ফজলুল করিম 'প্রতিরোধ'-এর সোমেন স্মৃতি-সংখ্যায় লিখেছিলো,

"১৯৪২ সনের মার্চ মাসে সোমেন চন্দ যখন নিহত হয়, আমাদের মুসলমান ছাত্র সমাজের বৃহত্তর অংশ তখন নিজেদের নেতৃবৃন্দের মান অপমানের পরিমাণ নির্ধারণ লইয়া ব্যস্ত। কোন বিশিষ্ট নেতাকে পুষ্প-মাল্য প্রদান বা অপর কাহাকে কালো পতাকা প্রদর্শন, ইহাই ছিলো আমাদের রাজনীতির তখনকার বৈশিষ্ট্য। আমাদের সেই চেতনাহীন অবস্থাতে সোমেন চন্দের মৃত্যুকে আমরা হয়তো ঠিকভাবে দেখিতে পারি নাই। এমনি সময়ে শুনিয়াছিলাম সোমেনের মৃত্যুর কথা। ঢাকা শহরের চির পুরাতন দাংগা ব্যতীত সেইদিন তাহাকে কিছু ভাবিতে পারি নাই।...সোমেন চন্দ যখন মারা যায় তখন তাহাকে চিনিতামনা—চিনিবার পর্যায়ে ছিলাম না। সোমেনকে চিনিলাম তাহার 'সংকেত ও অন্যান্য গল্প' প্রকাশ হইবার পরে।" সরদার ফজলুল করিমের লেখাটি পড়ে মুনীর চৌধুরী বলে, আমার দুঃখ যে আমি সোমেনকে দেখিনি। সানাউল হক সায় দেয়, একই দুঃখ আমারও। হঠাৎ করেই যেন সবাই বিষন্ন হয়ে যায়। ঘরের আবহাওয়া ভারি হয়ে ওঠে। নির্বাপিত একজন মানুষের উপস্থিতি এমনই জোরালো। ব্লাক আউটের রাত উপেক্ষা করে গল্প করতে করতে সবাই ঘরে ফেরে। মুনীর বলে, দেখলে হয়তো আমরা আরো একটু অন্যরকম হতে পারতাম। আরো কিছু শিখতাম।

রণেশ বলে, সোমেনের প্রস্থান এবং তোমাদের প্রবেশ এটাই সবচেয়ে বড় আমাদের কাছে। আমরা উত্তরণ চাই, গতি চাই। কাজ ধরে এগিয়ে যেতে চাই।

মুনীর জোরের সঙ্গে বলে, তবু সোমেনকে দেখার বড় আকাঙ্খা ছিলো আমার।

সানাউল হক বলে, কিছু কিছু মানুষ থাকে যাদের খুব কাছে গিয়ে দাঁড়াতে ইচ্ছে করে। তাঁরা যেন ছায়ার মতো।

সোমেনকে নিয়ে কথা জমে ওঠে। সবার মুখে মুখে ওর নাম উচ্চারিত হয়।

একটি রক্তাক্ত মৃত্যুকে সামনে নিয়ে বাংলা সাহিত্য ও রাজনীতির শুভ উদ্বোধন ঘটে।

মুনীর চৌধুরী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষ ইংরেজি অনার্সের ছাত্র। সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে থাকে। সোমেনের প্রথম স্মৃতি বার্ষিকী উদ্যাপিত হবে। অনুষ্ঠান আয়োজনের দায়িত্ব তার ওপর। প্রবল উৎসাহ নিয়ে কাজ করে মুনীর। বক্তা ঠিক করা, প্যান্ডেলের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি হাজার কাজ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক অজিত

গুহ। ছাত্র প্রতিনিধি হিসেবে বক্তৃতা করে মুনীর চৌধুরী। উপস্থিত দর্শক মুগ্ধ বিস্ময়ে সে বক্তৃতা শোনে। অল্প বয়সেই চমৎকার করে বক্তব্য গুছিয়ে বলতে পারে। সভা শেষে অজিত গুহ পিঠ চাপড়ে বললেন, চমৎকার বলেছো। প্রগতিশীল সাহিত্য আর মার্ক্সীয় রাজনীতির যে যোগ ঘটালে তোমাদের হাতে তার যেন উত্তরণ ঘটে সেদিকে খেয়াল রেখো।

ছিপছিপে লম্বা, শ্যামলা রঙের মুনীর লাজুক হাসে। সে বছরই সে হলের সেরা বক্তা হিসেবে প্রোভস্টের কাপ পায়। যেমন তার যুক্তি তেমন তার গলার ওঠানামা। মুনীর যখন বক্তৃতা করে তখন উত্থানে পতনে আবেগে ভালোবাসায় মুদ্রিত হয়ে যায় শ্রোতার চিত্তে। শুধু তাই নয় ছোটগল্প লেখক হিসেবেও বেশ নাম করেছে। প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের সাহিত্য সভায় মাণিক বন্দোপাধ্যায় তাঁর গল্প শুনে বলেছেন, জিনিয়াস। সবার সপ্রশংস দৃষ্টির সামনে থেকে পালাতে পারলে যেন বাঁচে। কেবলই মনে হয় সবেতো শুরু। এখনো দীর্ঘ পথ বাকি। পাড়ি দিতে হবে হাজার হাজার দিন রাত। পারবে কি সাফল্যের তীরে পেঁছুতে ? বুকে পিপাসা, ভালো কিছু করা চাই, ভালো কিছু। হচ্ছেনাতো তেমন কিছু। কতদিন অপেক্ষা করতে হবে, কতদিন ! বুকের ধুকপুকানি বেড়ে যায় ওর। কোনোকিছুতে স্বস্তি নেই। রণেশ একদিন হেসে বলেছিলো, সাহিত্য আর রাজনীতি সহজ কথা নয় মুনীর। ধরে রাখাটাই বড় কথা।

আমি পারবো রণেশদা।

রণেশ দৃঢ় গলায় বলে,

আমি জানি তুমি পারবে। তোমাকে পারতেই হবে।

আপনার বুকভরা কথায় মন জুড়িয়ে গেলো। এমন প্রেরণাইতো দরকার যা শুধু সামনে এগিয়ে দেয়। আপনার কথা আমার চিরকাল মনে থাকবে রণেশদা।

রণেশ সস্নেহে তাকিয়ে থাকে। ওর বুক ভরে যায়। মানুষের সাফল্য ওকে বড় আনন্দিত করে। ও সেই আনন্দ নিজের মনে করে উপভোগ করে। ঈর্ষা নেই, বিদ্বেষ নেই, কেবলই ভালোবাসা। রণেশের বুকে ভালোবাসা প্রবাহিত হয়। মুনীর মানুষটিকে প্রিয়জন ভাবে।

চলেন রণেশদা চা খাই !

চলো। এই একটা ব্যাপারে আমার আপত্তি নেই।

দু'জনের সামনে চায়ের কাপ, দোকান সরগরম। মুনীরের সামনে থেকে মুছে যায় সব। জেগে থাকে এক দীর্ঘকায় লোক।

কি ভাবছো!

কিছু না।

আনমনা দেখাচ্ছে তোমাকে।

মুনীর মৃদু হাসে, কথা বলে না। আশেপাশের টেবিলে তখন চায়ের কাপে ঝড়। ও কেবলই ভাবে রণেশদা এত ভালোমানুষ কেন?

তারুণ্যে দীপ্ত মুনীর হটে যাবার পাত্র নয়। আস্তে আস্তে ঝরে যায় তার পাথরের বোতাম লাগানো শেরওয়ানি। ঝরে যায় বাহ্যিক ফাঁপানো জৌলুস। সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে অন্তর, বেগবান ধারায় বয় মননের নদী, উর্বরা পলিমাটি ভরে ওঠে ফসলের ঐশ্বর্যে। বৈশাখের খর-রোদ্দুর মাথায় করে হেঁটে যাওয়া মুনীরের দীর্ঘ ছায়া পড়ে রাজপথে, মনে হয় একটা বিশালাকায় মানুষ যেন দিগন্ত ছুঁতে যাচ্ছে।

যুদ্ধের অনিবার্য পরিণতি হিসেবে দুর্ভিক্ষের কালো ছায়া ঘনিয়ে উঠেছে। নিরন্ন মানুষের হাহাকার গ্রাম থেকে ছুটে আসছে শহরের দিকে। দুষ্প্রাপ্য হয়ে যাচ্ছে চাল, তেল, নুন, কেরোসিন, দিয়াশলাই। জীবনযাপনের খুঁটিনাটি জিনিসগুলো রাতারাতি মানুষের আওতার বাইরে চলে যাচ্ছে। কালোবাজারি, মুনাফাখোর, দালালেরা রচনা করেছে ঘৃণিত ইতিহাস। তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে বাংলার মানুষ মুখ থুবড়ে পড়লো। ভয়াবহ ক্ষুধা চারদিকে, সুজলা-সুফলা শস্যশ্যামলা বাংলা কোথাও নেই। হাতবাড়িয়ে আছে ছোট্ট শিশু, হাতবাড়িয়ে রাখে বৃদ্ধ, যুবকের পেশিবহুল হাতও প্রসারিত। সবাই চায়, নিজেরাই জানেনা কার কাছে চায়। ফোঁটা-ফোঁটা জল ঝরে, হাত শুকিয়ে কালো কয়লা হয়। সে হাতে অন্ন ওঠে না। মানুষ ছুটে যাচ্ছে কলকাতায়, হাড্ডিসার কঙ্কাল, কোটরগত চক্ষুতে বিদীর্ণ আর্তনাদ, আমাকে বাঁচতে দাও। কে কাকে বাঁচাবে? যারা বাঁচাতে চায় তাদের ক্ষমতা সীমিত, যারা বাঁচাতে পারবে তারা নিজ নিজ ভাগবাটোয়ারায় ব্যস্ত। বিপন্ন মানবতার জন্যে ওদের কোনো মাথাব্যথা নেই। রাস্তার ধারে পড়ে থাকে মানুষ। কাক-শিয়ালে খুবলে খায় তাদের শরীর। নিষ্প্রাণ প্রেতপুরী হয়ে যায় শহর। ধাক্কাটা কলকাতায় বেশি, চারদিক থেকে মানুষ কলকাতায় যাচ্ছে। ঢাকার জের তুলনামূলকভাবে কম।

তবু বুক মুচড়ে ওঠে। কেরোসিনের জন্যে লম্বা লাইনে দাঁড়ালে খচে যায় মেজাজ। রণেশ, সত্যেন সেনরা একটা কমিটি করেছে। চাঁদা তুলে রিলিফ দিচ্ছে বিভিন্ন এলাকায়। তবু শেষ রক্ষা হয় না। মৃতের সংখ্যা বাড়তেই থাকে।

একদিন 'প্রতিরোধ' অফিসে জয়নুল আবেদিনের আঁকা ছবি দেখে চমকে উঠলো মুনীর। ঠোঁট গড়িয়ে বেরিয়ে এলো একটি শব্দ, অসাধারণ।

দেখুন রণেশদা !

কাগজটা মেলে ধরে রণেশের সামনে।

সত্যি তুলনা হয়না। কোনো শৌখিন চিত্রকলা নয়, জীবনের ঘনিষ্ঠ চিত্র।

ওরা সবাই ঝুঁকে পড়ে দেখে মণ্বন্তরের ছবি। কঙ্কালসার একটি মেয়ে ফুটপাথে মরে পড়ে আছে আর বুকের পাশে একটি বাচ্চা চিৎকার করে কাঁদছে। আর একটি ছবিতে মৃতদেহের ওপর কাক, পাশেই ডাস্টবিন থেকে নোংরা খাচ্ছে কুকুর। যেন মানুষ আর কুকুরে কোনো পার্থক্য নেই।

রণেশের চোখে জল। মুনীর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। শুধু চারকোল দিয়ে এমন অপূর্ব সৃষ্টি করা যায় ভাবলে অবাক লাগে। ঠিকানা জানা থাকলে আমি জয়নুল আবেদিনকে অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি লিখতাম।

দেখো মুনীর জয়নুল আবেদিনের এই প্রদর্শনী দেশে-বিদেশে কি বিপুল সাড়া জাগিয়েছে। অনেক বক্তৃতা, সংবাদ পত্রের খবর যা করতে পারেনি এই প্রদর্শনীর প্রাণবন্ত জীবন্ত ছবিগুলো তা করতে পেরেছে—মুহূর্তে পৌঁছে গেছে মানুষের হৃদয়ের কাছে।

ঠিকই বলেছেন রণেশদা।

আমরা এমনই চাই মুনীর। চাকচিক্যের আড়ালে যেন শিল্পের প্রাণ ঢাকা না পড়ে।

ঠিক।

আত্মপ্রত্যয়ের দৃঢ়তায় কণ্ঠ প্রগাঢ়। মণ্বন্তরের বাংলাদেশের ওপর দীর্ঘ কালো ছায়া ফেলে হাঁটতে হাঁটতে মুনীর চৌধুরী বরিশালের ঘন-সবুজ প্রকৃতি দেখতে পায়, দেখে মানিকগঞ্জের নদী, নোয়াখালির বিস্তীর্ণ জনপদ। সবকিছুর ওপর দিয়ে ছুটে আসছে মানুষ, কালো মানুষের স্রোত। এই বাংলাদেশ ওদের জন্মজন্মান্তরের, এই মাটি

ওদের উত্থান এবং পতনের, এই মাটি ওদের অন্তিম শয়ানের। চোখ বুজলে পুরো ছবি দেখা যায়। শুধু পথ আবিষ্কার করা দরকার, যে পথ মানুষের অধিকারের দাবিকে দু'হাতে উপরে উঠিয়ে স্বাগতম জানাবে। তাই যুদ্ধ, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আর বিভেদকে অতিক্রম করে লাল নিশানের ঠিকানায় পেঁছুতে হবে। যেখানে মানুষ মানবেতর জীবন যাপন করে না, যেখানে মানুষ ছোট-বড় ভেদে সত্যিকারের মানুষের মর্যাদা পায়। মণ্বন্তরের বাংলা-দেশে একদিন সুদিন আসবেই।

'প্রতিরোধ' অফিস থেকে হাঁটতে হাঁটতে হলে ফিরে মুনীর। খেয়ে-দেয়ে দুপুরে কড়া একটা ঘুম দেয়। বিকেলে রিহার্সেল আছে। হল ছাত্র-সংসদের পক্ষ থেকে দু'দিন পরই নিজের লেখা নাটক 'রাজার জন্মদিনে' মঞ্চস্থ হবে। ছোট্ট একাংকিকা, প্রধানত কৌতুক রসে ভরপুর, তবে ব্যঙ্গের ঝলক আছে। ব্যঙ্গ তার প্রিয় বিষয়। দেশ-বিদেশের সাহিত্য সম্পর্কে তার তির্যক এবং শাণিত মন্তব্যের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে দারুণ আলোচিত। ছাত্র-শিক্ষক সবাই ওকে পছন্দ করে। বিশেষ করে ইংরেজি বিভাগের মন্মথ ঘোষের কাছে ও ভীষণ প্রিয়। মন্মথ ঘোষ শেক্সপীয়র পড়ান। মাঝে মাঝে মুনীরকে দিয়ে শেক্সপীয়রের অংশ বিশেষ পাঠ করান। পিন-পতন নিস্তব্ধতায় ছেলেরা পাঠকের কন্ঠের কারুকাজ উপভোগ করে। নাটকের দিন মুনীর দারুণ ব্যস্ত। সলি-মুল্লাহ মুসলিম হল অডিটোরিয়ামে নাটক হবে। চেয়ার-টেবিল ও মঞ্চের বিভিন্ন উপকরণ টানাটানি করে ঘেমে উঠেছে। বড়ভাই কবীর চৌধুরীকে দেখে লাজুক ভঙ্গিতে এগিয়ে আসে।

কি রে খুব ব্যস্ত বুঝি ?

না, সব গুছিয়ে এনেছি প্রায়। জানেন মন্মথ স্যার আসছেন নাটক দেখতে ?

তাই ? তোর জন্যেতো খুশির খবর।

দারুণ খবর বলেন। আমিতো উৎসাহে আপ্লুত। সন্ধ্যায় স্যারের রেডিও প্রোগ্রাম ছিলো। নাটক দেখবেন বলে তিনি কথিকাটি কর্তৃপক্ষকে বলে আগেই রেকর্ড করিয়ে নিয়েছেন।

স্যার তোকে ভালোবাসেন।

কবীর চৌধুরীর কথায় মুনীর হেসে আবার ব্যস্ত হয়ে পড়ে। দর্শকদের বসার জায়গার তদারকী করছে, বিশিষ্ট অধ্যাপকদের আসন নির্দিষ্ট করে রেখেছে। তার উৎসাহ এবং উদ্দীপনায় কবীর চৌধুরীর

ভালোলাগে। ও যে এত নাটক-অন্ত প্রাণ হবে ভাবাই যায়নি। নাটক লিখলেই পাণ্ডুলিপি তাকে পড়তে দেয়, নইলে সব ভাই-বোনকে জড়ো করে ঘরোয়া পরিবেশে গলার স্বর ও ভঙ্গি সহকারে পড়ে শোনায়। জমজমাট একটা আবহ সৃষ্টি হয়ে যায়। কবীর চৌধুরী একটি চেয়ারে বসে পড়েন। ভালোয় ভালোয় নাটক শেষ হয়।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মুনীর, অতিথিরা বিদায় নিচ্ছে,ওকে প্রশংসা করছে, মৃদু হেসে ঘাড় নাড়ছে ও। শ্যামলা উজ্জ্বল রঙের দীপ্তিতে তারুণ্যের চকমকি, মনে হয় যেন মুনীর নয়, অন্য কেউ অনেক দূরের, যে তার প্রতিভা আর মেধার সমন্বয়ে উঠে যাচ্ছে, উঠছেই কেবল। রাত বাড়ে, সবাই চলে গেছে, ওর সঙ্গীরা দু'চারজন ঘুরছে, সব গুছিয়ে হলে ফিরতে রাত হয়ে যায় অনেক। বারবার মন্মথ স্যারের কথা মনে হয়, স্যার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন, দু'এক জায়গায় সাজেশন দিয়েছেন। শেষে বলেছেন, তুমি নাটক ভালো বোঝ।

মন্মথ স্যার ওকে এতোটা প্রশংসা করবে ও নিজেও ভাবেনি। হঠাৎ লনে দাঁড়িয়ে পড়ে, গুনগুনিয়ে গান গায়, ঐ ছোট ঘরে ফিরতে ইচ্ছে করে না। বাগানের ধারে সিঁড়ির ওপর বসে পড়ে।

বাশার বলে, কি রে ঘরে যাবি না ?

যাচ্ছি, তুই যা।

চারদিক সুনসান, গাছের ঝোপে জোনাকীর জ্বলে ওঠা নিভে যাওয়া দৃষ্টি ধরে রাখে, কিন্তু ভাবনায় অন্যমনস্ক মুনীর নিজের সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করে ফেলে।

বিড়বিড় করে বলে, প্রয়োজনে অন্য লেখা লিখলেও নাটকই হবে আমার সৃষ্টিশীল রচনার শিল্প মাধ্যম। এখন থেকে গল্প নয়, কবিতা নয়, নাটকই আমার প্রাণ, আমার অস্তিত্ব। বুকের রক্ত মাখিয়ে আমি আমার সৃষ্টিকে কালজয়ী করবো।

আত্মবিশ্বাসে মহীয়ান হয়ে যায় ও। মাথার ভেতরের অন্যমনস্ক শূন্যতা আর নেই। মনে হয় মগজের প্রতিটি প্রান্তরে অর্থবহ সংকেত, দ্রিম দ্রিম লয়ে ঢোল বাজছে, কারা যেন মিছিল করে আসছে। মুনীর বাগান ছেড়ে সিঁড়িতে পা রাখে। এক ধাপ, দু'ধাপ করে উঠছে। তেতলার ঘরে পেঁছুতে হবে তাকে।

ক'দিন ধরে বেশ নাটকের জের চলছে। ক্লাশে, করিডোরে, চত্বরে সব জায়গায় পক্ষে বিপক্ষে আলোচনা হয়। শুনতে ভালোই লাগে। একদিন পার্টি অফিসে রণেশকে ধরে বসে, রণেশদা আপনি কিছু বলছেন না যে ?

আমার কি মুখ ফুটে কিছু বলতে হবে ?

বলুন না রণেশদা ? আপনার সমালোচনা আমার কাজে লাগবে ?

মুনীর নাটকের মাধ্যমে আমাদের সমসাময়িককালকে চিরকালীন সত্যে তুলে ধরতে হবে। বাস্তবের কষাঘাতে, বেদনার তীব্রতায় জীবনকে অর্থবহ করতে হবে। রচনার ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষা তোমার সৃষ্টিশীল সৌকর্য বাড়াবে।

আপনার কথা আমি মনে রাখবো রণেশদা।

কোথায় যাবে এখন ?

ব্রিটানিয়ায় একটা ভালো ছবি এসেছে, দেখে আসি।

রণেশ হাসতে হাসতে বলে,

ছবির নেশা ছাড়তে পারলে না।

পারবো হয়তো, যেহেতু এটা এমন কিছু মহৎ নেশা নয়, কি বলেন ? তবে উৎকৃষ্ট ফিল্ম কিন্তু শিল্পের রুচির ধার বাড়ায় রণেশদা।

অস্বীকার করি না।

চলি, সন্ধ্যায় পার্টি অফিসে দেখা হবে।

একটা রিক্সায় উঠে পড়ে ও। এলোমেলো অবিন্যস্ত চুল বাতাসে ওড়ে। বারবার ওথেলো নাটকের সংলাপ আওড়ায়। এ নাটকের বহু সংলাপ ওর মুখস্ত। যখনই একলা হয় আওড়াতে থাকে। তখন নিঃসঙ্গ লাগেনা, মনে হয় ওর সঙ্গে কেউ আছে, একজন মনোরম সঙ্গী। বিকেলে ব্রিটানিয়া থেকে হলে ফিরতেই একদল মারমুখি ছেলের মুখোমুখি হয়। ওরা যেন আগে থেকেই প্রস্তুত হয়েছিলো। হাবিব এগিয়ে এসে বলে, আমরা তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম।

বলো, কি বলবে ? এখানে বলবে না কি ঘরে যাবে ?

তুমিতো কমিউনিস্ট, কমিউনিস্টরা মুসলমান নয়, সুতরাং এই হলে তুমি থাকতে পারবে না, তোমার থাকার অধিকার নেই ?

এই চল, ওর বিছানাপত্র বাইরে ফেলে দেই।

ছেলেরা হৈ-হৈ করতে করতে ওর পাশ কাটিয়ে উপরে উঠে যায়। ঘটনার আকস্মিকতায় মুনীর বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর দ্রুত উপরে উঠে আসে।

আমার একটা বইয়ে হাত দেবে না বলছি ? বেশি বাড়াবাড়ি করলে রক্তারক্তি কান্ড হয়ে যাবে ?

ততক্ষণে আশেপাশের ঘর থেকে অন্য ছেলেরা এসে জড়ো হয়। বিরোধী ছেলেরা রেলিং গলিয়ে তোষক-বালিশ ইত্যাদি ফেলে দিয়েছে। কাজী দীন মুহম্মদ আর কে, এম, মুনীম প্রবল প্রতিবাদ করে।

তোমরা গায়ের জোরে এইভাবে কারো বিছানাপত্র ফেলে দিতে পারো না ? আমরা সবাই ছাত্র, পড়ালেখা করতে এসেছি। কে কমিউনিস্ট, কে নয় এইসব বিচার করার জায়গা এটা নয়।

দীন মুহম্মদের কথায় ছেলেরা চলে গেলেও মুনীরকে শাসিয়ে যায়।

দেখে নেবো। অসাম্প্রদায়িকতার নামে নাস্তিকতা চালানো চলবেনা।

মূর্খের সঙ্গে তর্ক চলে না। বাক্য ব্যয় বৃথা।

রাগে গরগরিয়ে ওঠে ও। এতক্ষণ প্রচুর সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছে। তেড়ে আসে জয়নুল।

কি বললে ?

আহ্ তোমরা থাম। যাও নিচে যাও।

নিজের পক্ষের ছেলেদেরকে ঠান্ডা করে দীন মুহম্মদ। নিজের আদর্শ যাই থাক না কেন মুনীরকে সমীহ না করে পারে না। সমসাময়িক ছাত্রদের মধ্যে ওর মতো বক্তা আর কজন আছে ? কিছুদিন আগেও নিখিল বঙ্গ সাহিত্য প্রতিযোগিতায় সবচেয়ে বেশি পুরস্কার পেয়েছে মুনীর চৌধুরী।

আপনি না থাকলে পরিস্থিতি আজ অন্যরকম হতো ?

না, মুনীর না। উত্তেজনার মুখে মাথা ঠান্ডা রাখতে হয়। ওরা প্রভোস্টের কাছে দরখাস্ত করবে তোমাকে যাতে হলে থাকতে না দেয়া হয়। কিন্তু তা হতে পারবেনা আমরা বাধা দেবো।

ওরা এতদূর নেমেছে ?

দীন মুহম্মদ হাসে। তারপর সিঁড়ি দিয়ে মুনীমসহ নেমে যায়।

সন্ধ্যায় পার্টি অফিসে ঘটনাটা বলে ফেটে পড়ে মুনীর।

সেদিনই রংপুর থেকে এসেছে সত্যেন সেন, কৃষক নেতা। গ্রামে গ্রামে ঘুরে কাজ করেন। মুনীরের সঙ্গে প্রথম আলাপ। শুধু মৃদু হেসে বলেন, ঘাবড়াবার কিছু নেই। বাধা দিলে বাধবে লড়াই। দেখে এলাম রংপুরে তেভাগা আন্দোলন কেমন দানা বেধে উঠেছে। কৃষকদের আর কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না। ওরা নিজেদের অধিকার বুঝতে শিখেছে। নীলফামারীর ডিমলা, ডোমার আর জলঢাকা থানার অবস্থাতো সাংঘাতিক। ওখানকার জোতদাররা চাষীদের ঐক্যে তটস্থ। আর আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে ওদের সঙ্গে হেরে যাবো ? অশিক্ষিত কৃষকেরা যা পারে আমরা তা পারবো না মুনীর ?

আমাদের একটাই ভয় সত্যেনদা, আমরা মধ্যবিত্তের সন্তান।

মনীরের এই তীক্ষ্ণ মন্তব্যে চুপ করে থাকে সত্যেন সেন। বয়সে তরুণ হলেও কথাটা ঠিকই বলেছে। কৃষকদের কথায় মনীরের উত্তেজনা কমে যায়।

কৃষক নেতা কম্পরাম সিং-এর অনেক গল্প শুনেছি, আপনি তার কথা কিছু বলুন সত্যেনদা ?

বাকীরাও এগিয়ে আসে। আপনি তো সেখান থেকেই এলেন, বলুন ওদের কথা।

এই গলপ বললে তো রাত ফুরিয়ে যাবে। আমি কম্পরাম সিং-এর একটা ঘটনা বলবো মাত্র।

তাই বলুন।

সকলে সত্যেন সেনের পাশে জড়ো হয়ে বসে। শুধু কাগজে ছিটেফোঁটা পড়ে মন ভরে না। সবাই মানুষের মিলিত শক্তির অমিত বিক্রমের কথা জানতে চায়। সত্যেন সেন শুরু করে ঃ

"দিনাজপুর জেলার লাহিড়ীহাটে মে দিবসের উৎসব। দিনাজপুর শহর থেকে লাহিড়ীহাটে যেতে হলে ঠাকুরগাঁ হয়ে যেতে হয়। ঠাকুরগাঁর পরের স্টেশন আখানগর। আখানগর থেকে লাহিড়ীহাট পর্যন্ত বরাবর একটা কাঁচা রাস্তা চলে গিয়েছে। মাইল সাতেকের পথ। লাহিড়ীহাট নাম করা হাট। বহুদূর থেকে লোকেরা সেখানে হাট করতে আসে।

মে দিবসের সভা। বিরাট সভা। কৃষক সমিতির ডাকে চারদিককার গ্রামগুলি ভেংগে লোক এসেছে। এখনও আসছে। হাজার কুড়ি লোক সভায় জমায়েত হয়েছে। দিনাজপুরের বিশিষ্ট কৃষক নেতাদের মধ্যে প্রায় সবাই এসেছেন।

লাহিড়ীহাট উৎসব সজ্জায় সেজেছে। সভার সামনে বিরাট এক লাল নিশান সগর্বে পত্‌পত করে উড়ছে। গেট সাজানো হয়েছে লাল ফেস্টুন দিয়ে। এদিকে, ওদিকে চারদিকেই লাল নিশানের ছড়াছড়ি। যেদিকেই তাকাও লালে লাল। মে দিবস সারা পৃথিবীর মেহনতী মানুষের আনন্দ উৎসবের দিন। এই দিনেই সংগ্রামী শ্রমিকদের বুকের রক্তে রঞ্জিত লাল নিশানের জন্ম হয়েছিল। সেদিন থেকে এই লাল নিশান সারা বিশ্বের মজুর, কৃষক ও সমস্ত মেহনতী মানুষকে সংগ্রামের পথ নির্দেশ করে চলেছে।

কিন্তু এই আনন্দ উৎসবের মাঝখানেও একটা দুঃখের কালোছায়া ছড়িয়ে পড়েছে। একজনের অনুপস্থিতি সবাইকে ব্যথিত করে তুলেছে।

এখানে ওখানে বলাবলি চলছে—এখন উৎসবের দিন, এত লোক জড় হয়েছি আমরা, কিন্তু কম্পদা আজ সভায় থাকতে পারলেন না। এত লোকের মাঝখানেও কেমন যেন খালি খালি লাগছে।

সকল সময় কাজে যিনি পুরোভাগে থাকেন, কাজে-কর্মে যার উৎসাহ আর সকলের উৎসাহকে ছাপিয়ে উঠে, সেই কম্পদা বা কম্পরাম সিং আজ সভায় উপস্থিত থাকতে পারে নি। তার অভাবটা সবার মনেই বাজছে। কম্পদার একটি মাত্র ছেলে। অনেক দিন থেকেই সে রোগে ভুগছিল। সেই ছেলে গত রাত্রিতে মারা গিয়েছে। এ অবস্থায় কম্পদা কি করেই বা আসবে। তিনি ছেলের শবদেহ দাহ করবার জন্য অন্যান্য শ্মশানবন্ধুদের সঙ্গে শ্মশানে গেছেন।

সভার উদ্যোক্তরা সভার কাজ শুরু করবার জন্যে উদ্যোগ আয়োজন করছেন। একজন নওজোয়ান সভার আরম্ভ ঘোষণা করবার জন্য শ্লোগান দিতে শুরু করলেন। সংগে সংগে হাজার হাজার মিলিত কন্ঠের আওয়াজ উঠল। সেই মিলিত আওয়াজে সারা আকাশটা থেকে থেকে কেঁপে উঠতে লাগল।

শ্লোগান থামতেই সভার লোকেরা সচকিত হয়ে শুনল, দূর থেকে অনুরূপ আওয়াজ ভেসে আসছে। কি প্রতিধ্বনি? না প্রতিধ্বনি নয়, লক্ষ্য করে বোঝা গেল, কারা যেন শ্লোগান দিতে দিতে সভাস্থলের দিকে এগিয়ে আসছে। সম্ভবত কোন গ্রাম থেকে এক দল কৃষক সভায় যোগ দেওয়ার জন্য আসছে। ঠিকই তাই। একটু বাদেই দেখা গেল, একটা মিছিল একটা ঝোপের আড়াল কাটিয়ে হঠাৎ সামনে চলে এল। কারা এরা? সবাই উৎসুক হয়ে লক্ষ্য করতে লাগল।

মিছিলটা কাছাকাছি এসে পড়তেই চমকে উঠল সবাই। মিছিলের সামনে সবার আগে এ কে? কম্পদা না? হ্যাঁ, কম্পদাই তো। তাঁর পাশে একটি শাদা থান-পরা বিধবা মেয়ে। কম্পদা তার হাত ধরে এগিয়ে আসছেন, আর তার সুপরিচিত জলদগম্ভীর কন্ঠে শ্লোগান দিচ্ছেন, "মে দিবস জয়যুক্ত হোক" "দুনিয়ার মজুর-চাষী এক হও।" মিছিলের লোকেরা গলায় গলা মিলিয়ে তাঁর আওয়াজে সাড়া দিয়ে চলেছে।

সেই মিছিল যখন সভার সামনে এসে দাঁড়াল তখন সবাই দেখল কম্পদার কোমরে গামছা বাঁধা, তাঁর মাথার রুক্ষ চুলগুলো উড়ছে। পিছনে আরও কয়েকজন শ্মশানবন্ধু, তাদেরও ঐ একই মূর্তি। চেহারা দেখে বোঝা যায় যে তাঁরা দাহকর্ম শেষ করেই শ্মশান থেকে সোজা সভার জায়গায় চলে এসেছে। তাদের পিছনে শ'খানেক লোক।

থান-পরা বিধবা মেয়েটির এক হাত কম্পদার হাতে আর এক হাত দিয়ে সে নিজের মুখ চেপে ধরে ফুলে ফুলে কাঁদছে। সে কি কান্না! কিন্তু কম্পরাম সিং-এর চোখে এক বিন্দু অশ্রু নেই। তিনি সামরিক কায়দায় লাল ঝাণ্ডাকে সালাম জানিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন আর সেই অশ্রুমতী মেয়েটিকে পরম স্নেহে নিবিড়ভাবে কাছে নিলেন। এমন একটা দৃশ্য দেখবার জন্য কেউ প্রস্তুত ছিল না। হাজার হাজার লোক, কারু মুখে কোন কথা নেই, সবাই অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সংগে সংগেই মঞ্চ থেকে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা নেমে এলেন। তাঁদের মধ্যে এক-জন দু'হাত বাড়িয়ে কম্পদাকে জড়িয়ে ধরলেন। সান্ত্বনার ভংগিতে কি একটা কথা যেন বললেন। কিন্তু কম্পদার মুখে কোন ভাববিকার লক্ষ্য করা গেল না। তেমনি অবিচল স্থির। কোন কথা না বলে বিধবা পুত্র-বধূর হাত ধরে তিনি মঞ্চের উপর গিয়ে উঠলেন।

সভাপতির অনুমতি নিয়ে কম্পদা কিছু বলবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। কুড়ি হাজার লোক উৎকর্ণ হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। কি বলবেন কম্পদা? এই মাত্র একমাত্র ছেলেকে পুড়িয়ে ছাই করে এলেন। আর এখনই উঠে দাঁড়িয়েছেন বক্তৃতা দিতে। এ মানুষ কি পাথর না লোহা দিয়ে তৈরী? কম্পদা বলে চললেন ঃ ভাইসব আজ মে দিবসের সভা। আমার আসতে একটু দেরী হয়ে গেল। কেন দেরী হল আপনারা হয় তো তা জানেন। আমার ছেলে, সে তো শুধু আমার ছেলেই ছিল না, সে ছিল আমার বিপ্লবের সাথী, আমার কমরেড। আমার সেই কম-রেড আজ আমার পাশে নেই। তাকে চিতার আগুনে ছাই করে দিয়ে এলাম। ভাইসব, আপনারা হয়তো ভেবেছিলেন যে, আমি সভায় আসব না। আত্মীয়স্বজনের মধ্যে অনেকে বাধাও দিয়েছিলেন। কিন্তু আজ মে দিবসের সভা। এই পবিত্র দিনে এখানে আমার হাজার হাজার ভাইরা মিলিত হয়েছেন। এমন দিনে আমি কি তাদের মধ্যে না এসে থাকতে পারি? ভাইসব, সারা দেশ জুড়ে লক্ষ লক্ষ কৃষক সন্তান আজ তিল তিল করে মৃত্যুমুখে এগিয়ে চলেছে, বেঁচে থেকেও তারা দিনরাত্রি মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করে চলেছে। তাদের বাঁচাবার জন্য আমাদের এই সংগ্রাম। তাদের কথা মনে করলে আমাদের এই ব্যক্তিগত দুঃখ তুচ্ছ হয়ে যায়। আপনাদের সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে আমি আমার পুত্রশোক ঝেড়ে ফেলে দিয়েছি।

সদ্য স্বামীহারা মেয়েটি কম্পদার পায়ের কাছে উপুড় হয়ে পড়ে-ছিল। কম্পদা তাকে তুলে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললেন, কাঁদিস না বেটী

কাঁদিস না। এই যে তোর সামনে হাজার হাজার কৃষক ভাইকে দেখছিস, এরা তোরই ভাই, তোরই আপন জন। এদের সবার সুখ দুঃখের সংগে তোর নিজের সুখ দুঃখ মিশিয়ে নে। এদের সংগে এক হয়ে সমিতির কাজে আপনাকে ঢেলে দে। এই পথেই শান্তি পাবি, আনন্দ পাবি।

এই বলে পুত্রবধূকে পাশে নিয়ে বসে পড়লেন কম্পদা। বিহ্বল জনতা কয়েক মুহূর্তের জন্য ভাষা হারিয়ে স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর গগণভেদী ধ্বনি উঠলো "কম্পরাম সিং জিন্দাবাদ।" ধ্বনির পর ধ্বনি উঠতে লাগল, ওরা কিছুতেই থামতে চায় না।"

হঠাৎ করে সত্যেন সেনের কণ্ঠ থেমে গেলে ওরা যেন ঘরজুড়ে সেই শ্লোগানের শব্দ শুনতে পায়। সত্যেন সেন চশমার কাঁচ মোছেন। কণ্ঠ ভারি, গলার কাছে বিশাল কিছু আটকে গেছে, শব্দ বেরুতে চায়না। মানুষটি সেই তিরিশের দশকে ছাত্রজীবনে কৃষক আন্দোলন শুরু করেছে। গ্রামে গঞ্জে ঘুরে ঘুরে মানুষের বুকের ভাষা পড়তে শিখেছে। এর মধ্যে বছর সাতেক জেল খাটা হয়ে গেছে, বিপ্লবী কর্মী হিশেবে কত যে পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে। তবু বিরাম নেই কাজের, অবিরাম করে যায় কাজ। এর মাঝে প্রগতি লেখক সংঘের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্যে গণ সঙ্গীত রচনা করে। সেগুলো সুর দিয়ে গাওয়া হয়। সবাই ভাবছে সত্যেন সেন আরো কিছু বলবে কিন্তু বলছে না দেখে উসখুস করে।

পেছন থেকে কে যেন বলে, আর কিছু নেই ?

সবটাই একবারে শুনতে চাও ? কম্পরামের কথা কি একবেলায় শেষ হবার ?

আবার কবে শুনবো ?

দেখি, কবে বসা যায়।

মুনীর চৌধুরী বলে, আমি সবটাই শুনতে চাই সত্যেনদা। শুধু কম্পরাম নয়, তন্নরায়ণের কথাও শুনবো।

সত্যেন সেন মাথা নাড়ে। ঘরে আবার নীরবতা।

গল্প শেষে দেখা গেলো সবার চোখে জল। মুনীর হাঁটুর মধ্যে মাথা রেখে বসে আছে। ওর বারবার মনে হয় মানুষকে জানতে হলে খুব কাছে থেকে জানতে হবে, বিশেষ করে যারা মাটির কাছাকাছি তাদের তো উপর থেকে দৃষ্টি ফেলে দেখা হয়না, দেখা উচিত নয়। অথচ এই মধ্যবিত্ত জীবন-যাপনে এতকিছু হয়ে ওঠে না, এত কিছু হয়না। সবটাই এলোমেলো, এলোপাথাড়ি। গভীর নিষ্ঠা আর সাধনা

দরকার ? নইলে ফাঁক থাকে, ফাঁক বেড়ে যায়। অস্থির লাগে, ছটফটিয়ে উঠে দাঁড়ায়। একসময় কাউকে কিছু না বলে চুপচাপ উঠে যায় ও। এই বছরই সে অনার্স পাশ করে এবং ছাত্র-সংসদের নির্বাচনে সহ-সভাপতির পদপ্রার্থী হয়ে কমিউনিস্ট হবার কারণে শফিউল আজমের কাছে পরাজিত হয়।

এর কিছুদিন পর অপ্রত্যাশিত আঘাত এলো বাবার কাছ থেকে। বাবা বড় সরকারী চাকুরে, পুত্রের মার্ক্সীয় রাজনীতিতে অসন্তুষ্ট। ডেকে বললেন, তোমার সংগে আমার আদর্শগত মিল নেই, আমরা দুই মেরুর লোক, তুমি কি মনে করো তোমার পক্ষে পিতার অর্থ সাহায্য গ্রহণ করা সম্মানজনক ?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মুনীর পিতার যুক্তি স্বীকার করে নেয়।

ঠিকই বলেছেন আপনি। ঠিক আছে এখন থেকে আমি আর আপনার অর্থ সাহায্য গ্রহণ করবোনা।

বেরিয়ে এলো বাড়ি থেকে, মন খারাপ। অনার্স পরীক্ষা হয়ে গেছে। এখনো রেজাল্ট দেয়নি। কি করবে ভাবছে। ঢাকা বেতারের এক বন্ধু প্রায়ই বলে বেতারের জন্য নাটক লিখে দিতে। ঠিক করলো, স্বনামে বেনামে নাটক লিখে নিজের খরচা চালাবে। ছোটবোন নাদেরা এই ব্যাপারে আরো সক্রিয়। বললো, ভয় নেই মেজোভাই, দিন আমাদের ঠিকই চলবে।

তোর সাহসের তুলনা হয় না।

শিখলাম তো তোমার কাছ থেকেই।

মুনীর হাসে।

দেখিসনি বাবার আমলাতান্ত্রিক মনোভাব, মনে নেই ছোটবেলার কথা ?

কোনটা ?

ঐ যে সরকারি গাড়ির ব্যাটারি ঠিক রাখার জন্যে বাড়ির কম্পাউণ্ডে গাড়ি ঘুরপাক খাচ্ছে—আর আমি হেঁটে স্কুলে যাচ্ছি ?

দু'ভাইবোনে হো-হো করে হাসে। মনের ভার কেটে যায়। রাতে হারিকেনের আলোয় বসে প্রচুর স্কেচ করে। এটা তার প্রিয় নেশা। মন খারাপ থাকলে আঁকতে বসে। তখন সময় চলে না, সময় ওড়ে। উড়তে উড়তে রাতের প্রহর পেরিয়ে যায়। কিছুদিন আগে বাবার অমতে বড় ভাই বিয়ে করেছেন। মনে মনে হাসে মুনীর, ভালোই করেছে। বাবা পরাজিত হচ্ছেন। ভাবতে ভাবতে বড় ভাইয়ের বউয়ের

একটা স্কেচ করে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেকক্ষণ দেখে নিজের কাছেই ভালোলাগে। মনে হয় ভালোই হয়েছে। ভাবীকে পাঠিয়ে দিতে হবে। স্কেচটা একটা শাদা খামে পুরে বইয়ের ভেতর রেখে দেয়। আঁকতে আঁকতে পরিচিত একটি মুখ মনের পটে ভেসে ওঠে। কিছুদিন ধরে সেই মুখটি ভালো লাগতে শুরু করেছে। সর্বক্ষণ অনুভবে থাকে, সর্বক্ষণ অদৃশ্য সঙ্গি হয়ে ফেরে। ভেতরে কেমন ওলোটপালোট হয়ে যায়। বুকের ভেতর ভয়ানক চাপ। কাউকে কিছু বলতে পারেনা। বোঝে যতক্ষণ আপন মানুষটিকে বলা না হবে ততক্ষণ মুক্তি নেই, তবু নিজেকে তৈরি করতে পারেনা। মনে হয় সময় হয় নি কথা বলার। কাগজ পেন্সিল গুটিয়ে বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ে। হারিকেন নেভানো হয়না। মনে হয় আজ রাতে ওটা জ্বলুক, জ্বলে জ্বলে সলতেটা পুড়ে ছাই হয়ে যাক। শুধু আলোকিত হয়ে থাক একটি মুখ, সুন্দর-স্নিগ্ধ, তার ভালোবাসার হিরন্ময় দ্যুতি হয়ে।

৭

আবার দাঙ্গা। সাম্প্রদায়িকতার বিষ বাষ্প ঘনিয়ে উঠেছে ঢাকার বাতাস। প্রগতি লেখক সংঘের লেখকরা পাড়ায় পাড়ায় শান্তি কমিটি করে পাহারা দেবার দায়িত্ব নিচ্ছে। সংঘের অফিস তখন জি. ঘোষের গলিতে একটি তিনতলা বাড়ির দোতলায়। কিভাবে পাহারা দেয়া হবে এইসব নিয়ে আলোচনায় মেতে ওঠে সবাই। কারা কোন এলাকায় থাকবে সেটাও ঠিক হতে থাকে। কমিউনিস্ট পার্টি অফিসে জোর তৎপরতা। যে কোনো মূল্যের বিনিময়ে এই দাঙ্গা প্রতিরোধ করতে হবে।

আসলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষের পর থেকেই দেশজুড়ে গণ-সংগ্রামের জোয়ার প্রবল শক্তিতে বহমান হয়ে ওঠে। কলকাতায় পুলিশের গুলিতে রামেশ্বর হত্যা, আজাদ হিন্দ ফৌজ দিবস, রশীদ আলী দিবসের গণ-বিক্ষোভ থেকে আরম্ভ করে শ্রমিক ধর্মঘট, ডাক কর্মচারীদের ধর্মঘট, পুলিশ ধর্মঘট, নৌ-বাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা প্রমাণ করে যে মানুষ স্বাধীনতার জন্যে মরীয়া হয়ে উঠেছে। এই পটভূমিতে এমন ভয়াবহ দাঙ্গা বিবেকবান মানুষকে হতচকিত করে দেয়। কংগ্রেসের আপোষকামী রাজনীতি এবং মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক বিভেদ নীতির কারণেই

বৃটিশ সরকার সুযোগ গ্রহণ করে। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে সাম্প্রদায়িকতা বিষাক্ত ক্ষতের মতো ছড়িয়ে পড়ে। কংগ্রেস নেতৃত্ব এই পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়। ১৯৪৬-এর ১৬ আগষ্ট মুসলিম লীগ নেতৃত্ব এক প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দেয়। কলকাতায় মুসলিম লীগের মিছিল বের হয়। শুরু হয় দুইপক্ষের লুটপাট, অগ্নি সংযোগ, জীবন নাশ। ধর্মীয় উন্মাদনা যে কি ভয়াবহ ভাবে মনুষ্যত্ব বিপন্ন করতে পারে তার প্রমাণ এই দাঙ্গা। ঢাকায় এই দাঙ্গা প্রায় চারমাস চলে। সোমেন পাঠাগার বন্ধ। ছেলেরা পড়তে আসে না, রাত হলে প্রেতপুরী হয়ে যায় সমস্ত শহর। কমিউনিস্টরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দাঙ্গা প্রতিরোধ করে। নারায়ণগঞ্জ সুতাকল অঞ্চলে দাঙ্গা বাধার পরিস্থিতি হয়েছিলো প্রায় কিন্তু কমরেডদের তৎপরতা ও সাহসিকতায় সে পরিস্থিতি আয়ত্তে আসে। ঢাকার রহিমাবাদে তিনশত স্বেচ্ছাসেবক পাহারা দিতে থাকে। একদিন পার্টি অফিসে খবর আসে রেলওয়ে কমরেড জহিরুদ্দীন লক্ষ্মীবাজারে একজন হিন্দুকে বাঁচাতে গিয়ে নিহত হয়েছে।

মুনীর চৌধুরী চেঁচিয়ে বলে' আমাদের এই অসাম্প্রদায়িক ভূমিকার জন্যে আমরা ভিন্নভাবে চিহ্নিত হচ্ছি রণেশদা ?

কেমন ?

রণেশ ভুরু কুঁচকে তাকায়।

আপনি এখনো শোনেন নি ? হিন্দুরা আমাদের বলে মুসলমানদের দালাল, মুসলমানরা বলে হিন্দুদের দালাল।

ঠিকই বলে, খাঁটি কথা।

হো-হো করে হেসে ওঠে অজিত গুহ।

শোনো যখন গ্রামে গ্রামে তেভাগা আন্দোলনে, টংক প্রথা বিরোধী আন্দোলনে মানুষ প্রাণপণ লড়ছে, রেল শ্রমিকরা নিজেদের দাবি আদায়ে সোচ্চার হয়ে উঠেছে, তখন শহুরে মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্তরা দাঙ্গায় মেতেছে। সুতরাং এমন কথা তারা বলবে, বলাটাই স্বাভাবিক। এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। তোমরা নিজেদের কাজ করে যাও।

অজিত গুহের বলিষ্ঠ কথায় মুনীরের উত্তেজনা কমে যায়। দাঙ্গার পটভূমিতে একটা লেখার কথা ভাবতে থাকে।

আমাদের প্রোগ্রামের কি হলো অজিতদা ? ও'রা তো আগামীকালই ছাড়া পাচ্ছেন। হ্যাঁ, এই ব্যাপারে আলোচনায় বসা যায়।

ঢাকা জেল থেকে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের বন্দীসহ আন্দামান প্রত্যাগত চব্বিশজন বন্দী মুক্তি পায়। এরা সাতদিন পার্টি অফিসে

থাকবে। এঁদের সম্বর্ধনার ব্যবস্থা করতে হবে। আপ্যায়নে যাতে ত্রুটি না হয় সেজন্য সবাই তৎপর।

দেখো আমি ঠিক করেছি জগন্নাথ হল মিলনায়তনে এঁদের সম্বর্ধনার ব্যবস্থা করা হবে। সভাপতি হবেন ফজলুল হক হলের প্রভোস্ট মাজহারুল হক। তোমরা কি বল ?

আমরা রাজি।

সবাই সায় দেয়।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে না ?

করতে পারবে ?

মুনীর যদি একটা একাংকিকা লেখে আর সত্যেনের গণ-সঙ্গীত আছে, কিছু আবৃত্তি এই দিয়ে একটা অনুষ্ঠান করা যায়।

রণেশের প্রস্তাবে ঘরে কিছুক্ষণ নীরবতা।

সান্ধ্য আইন চলছে শহরে ?

কেউ কেউ আপত্তি করে।

আমরা দিনের বেলায় করবো। মুনীর তুমি নাটক লিখতে পারবে ?

রণেশ জোরালো কণ্ঠে সব আপত্তি উড়িয়ে দিতে চায়।

কি, কথা বলছো না যে মুনীর ?

রণেশের কণ্ঠে ঝাঁঝ।

আমি পারবো রণেশদা।

ঠিক আছে, তাহলে অনুষ্ঠান হবে।

রণেশ একাই সব দায়িত্ব নিজ কাঁধে উঠিয়ে নেয়। হৈ-হুল্লোড়ে পার্টি অফিস থেকে বেরোয় সবাই। দু'দিন পার্টি অফিস জমজমাট থাকে। চব্বিশ জন বিপ্লবীকে এক সঙ্গে দেখার জন্যে কৌতূহলী মানুষ ভিড় জমায়। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে লোক আসে। দাঙ্গার বিরুদ্ধে এ যেন এক সবল প্রতিবাদ। রাত জেগে নাটক লেখে মুনীর। নাটকের নাম 'মানুষ'।

[বড় শোবার ঘর। ডান দিকে একটা খাট, একটু কোণাকুনি করে রাখা। মশারী ওঠানো। বামে মাঝারি রকমের টেবিল, তাতে শেড দেয়া ল্যাম্প, পাশে টেলিফোন। দু'একটা অতিরিক্ত বসবার জায়গা। একদিকে গোসলখানার দরজা, অন্যপাশে গরাদহীন কাঁচের বড় জানালা। পর্দা ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শোনা যাবে, দূরে, বহু কণ্ঠের মিলিত ধ্বনি,

বন্দেমাতরম্। এবং একটু কাছে প্রচণ্ড আল্লাহ্ আকবর রব। এই দুই চিৎকারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মাঝে মাঝে দেখা দেবে বন্ধ জানালার কাঁচের মধ্য দিয়ে দূরে লকলকে আগুনের শিখা, নীল আকাশকে রক্তিমাভ করে কাঁপছে। ঘরের মধ্যে চারজন লোক ও একজন অসুস্থ শিশু। খাটের ওপর বর্ষীয়সী আম্মাজান আধশোয়া অবস্থায় শিশুকে আস্তে আস্তে বাতাস করছেন। আবছা আলোতে আম্মাজানের ক্লান্ত উদ্বিগ্ন মুখ এক অদ্ভুত বিশাদভরা গাম্ভীর্যে স্তব্ধ। শিশুর অন্যপাশে পানির গ্লাস হাতে নিয়ে কিশোরী জুলেখা। মাথার ওড়নির এক অংশ ঝুলে মাটিতে পড়ে গেছে, লক্ষ্য নেই। ঘামে কপালের গুঁড়ো চুল গালে গলায় লেপ্টে আছে। অসহনীয় আতংকে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চোখে ভয়ার্ত অর্থহীন চাহনী। টেবিলের সামনে খাটের দিক পেছন ফিরে, কোমরের পেছনে দু'হাত মুঠো করে দাঁড়িয়ে আছেন আব্বাজান। নিশ্চল নীরব। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন টেবিলের ল্যাম্প সহস্র আলোরশ্মির কেন্দ্রস্থলে। যেন ভেতরের কোনো অশান্ত বিক্ষুব্ধ হিংস্র অন্তর্দ্বন্দ্বকে নিষ্পেষিত করে তবে তিনি সুস্থ রূপ ধারণ করবেন। টেবিল ল্যাম্পের সংকীর্ণ আলো পরিসীমার মধ্যে ফাঁপানো শাদা দাড়ি আর কপালের গভীর রেখা জ্বলজ্বল করছে। দ্বিতীয় ছেলে ফরিদ নিশাচর কোনো পশুর মতো সন্তর্পণে সামনে পায়চারী করছে। থমকে দাঁড়াচ্ছে। চোখেমুখে প্রতিহিংসার ছায়ারাজি। দূরে ধ্বনি উঠল বন্দেমা-তরম, তিনবার। হাজার কণ্ঠের আকাশ কাঁপানো হুংকার তারপরই, তীব্র অন্ধকার ছিন্নভিন্ন করে পাল্টা আহ্বান, আল্লাহ্ আকবর! কিছুক্ষণ সব স্তব্ধ।]

আব্বা। আল্লাহ্ আকবর! আল্লাহ্ আকবর! আল্লাহ্ আকবর!

জুলেখা। আব্বাজান! আব্বাজান!

আব্বা। কি! ভয় পেয়েছিস, না? ভীরু কোথাকার? ঈমানের ডাক শুনে আঁৎকে উঠছিলি? চুপ। কাঁদিস না। শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে শোন আবার! আল্লাহ্ আকবর, আল্লাহ্ আকবর। বল, ভয় লাগে এখনো?

জুলেখা ঃ না।

আব্বা ঃ ভেবেছিলি আমি পাগল হয়ে গেছি, না? কেন? জীবনে অনেক লোককে মরতে দেখেছি চোখের সামনে। শ্বাস বন্ধ হয়ে, চোখ উল্টে দিয়ে, জিভ বার করে, গলগল করে রক্ত বমি করে কত সুস্থ মানুষকে মরতে দেখেছি। কৈ কোনদিন ত উন্মাদ হয়ে যাইনি।

আম্মা ঃ (ফরিদকে) হাসপাতালে আরেকবার ফোন করে দেখবি ?
ফরিদ ঃ লাভ নেই। ওরা মোর্শেদ ভাইয়ের বর্ণনা টুকে রেখেছে। কোন সংবাদ পেলে আমাদের ফোন করে জানাবে বলেছে।
জুলেখা ঃ মোর্শেদ ভাই আমার জন্য বই কিনতে বেরিয়েছিল। মোর্শেদ ভাইকে আমি কেন যেতে বললাম।

আব্বা ঃ চুপ, চুপ নালায়েক মেয়ে। আদরের দেমাক করিস না অত। তুই, তুই কে ? মোর্শেদকে বাইরে পাঠাবার না পাঠাবার তুই কে ? যিনি পাঠাবার তিনিই পাঠিয়েছেন। মালাউনের ছুরির খোঁচায় মরণ, ওর তকদিরে লেখা ছিল, এমনি মওত ! আজ রায়ট হবে জানলেই যেন তুই সব রাখতে পারতি।
ফরিদ ঃ আব্বা।

আব্বা ঃ কি তোমারও ভয় হচ্ছে আমি উন্মাদ হয়ে গেছি ! আমি ভুলে গেছি বাপ হয়ে মেয়ের সঙ্গে কি করে কথা বলতে হয় ?
ফরিদ ঃ হাসপাতাল থেকে ওরা এখনও কোনো খবর দেয়নি, আপনি মিছেমিছি ওসব কথা কেন ভাবছেন ?
আব্বা ঃ হাসপাতাল ? ওরা তোমার ভাইকে ছুরি মেরে কোলে তুলে হাসপাতালে পেঁৗছে দিয়ে গেছে, না ? ওগো শুনেছো তোমার ছেলের কথা ? আমি জানি মোর্শেদকে এতক্ষণে ওরা কি করেছে। আমি জানি।
ফরিদ ঃ আব্বাজান, আপনি আর কথা বলবেন না। চুপ করে শুয়ে পড়ুন।

আব্বা ঃ চুপ করে শুয়ে থাকবো ? কেন ? ওরা আমার ছেলেকে কেটে, আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, শরীর থেকে গলা কেটে মাথাটা আলাদা করে ফেলেছে। মোর্শেদের কালো কোঁকড়া চুল চাকবাঁধা রক্তের দলার সঙ্গে লেপ্টে ওর গাঢ় মরা চোখ ঢেকে রেখেছে।

জুলেখা ঃ ভাইয়া, আব্বাকে চুপ করতে বল।
আব্বা ঃ কে, কে আমাকে চুপ করাবে ? তোরা মরে গেছিস। তোরা চুপ করে থাক। তোরা ওর ভাই নস, বোন নস। তোরা ওর কেউ নস। তাই তোরা চুপ করে আছিস। আমি ওর বাপ—
আম্মা ঃ জুলেখা !
জুলেখা ঃ আম্মা।

আব্বা ঃ আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, ওরা ওর কাটা মুণ্ডুকে কাঁসার থালায় সাজিয়ে ফেরি করে বেড়াচ্ছে, ওরা সবাই তাই দেখে বাহবা দিচ্ছে, ফুর্তির খাতিরে মুঠো মুঠো টাকা পয়সা ছড়িয়ে দিচ্ছে আমার ছেলের নরম সাদা গলাকাটা লাশের—

আম্মা ঃ খো দা আ !

আব্বা ঃ কে, কে খোদাকে ডাকলো ?

ফরিদ ঃ আম্মা, আম্মা কথা বলছ না কেন ? খোকার দিকে আঙ্গুল দিয়ে কি দেখাচ্ছ ?

জুলেখা ঃ ভাইয়া, খোকা যেন কেমন হয়ে গেছে। নড়ছে না। মুখের শিরাগুলো কি রকম নীল হয়ে ফুলে উঠেছে।

আব্বা ঃ দেখি, দেখি। আমায় দেখতে দাও। জুলি অমন ঝুঁকে পড়ে রইলি কেন ? পানি, একটু পানি নিয়ে আয়। [জুলি গ্লাস থেকে চামচে পানি ঢালে] ফরিদ, তুমি একবার হাস-পাতালে, ডাক্তার, যে কোন ডাক্তারকে একবার খবর দাও। যত টাকা লাগে দেবো, সে যেন দেরী না করে সোজা এখানে চলে আসে।

ফরিদ ঃ তাতে কোনো ফল হবে না আব্বা। আরো দু'বার ফোন করেছি, এই দাংগার ভেতর জীবন বিপন্ন করে কোনো ডাক্তার আসতে রাজী নয়।

আব্বা ঃ কেউ আসবে না ? কেউ নয় ? সবার জীবনের মূল্য আছে, শুধু আমার ছেলেটার নেই ?

জুলেখা ঃ আব্বা, খোকা পানি খাচ্ছে না ! ঠোঁটের দু'পাশ দিয়ে সব গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে।

ফরিদ ঃ আব্বা আমি যাই।

আব্বা ঃ কোথায় ?

ফরিদ ঃ ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসি।

আব্বা ঃ না না। তুই যেতে পারবি না। তুই আমার চোখের সামনে থাকবি। কোথ্থাও যাবি না। আমি বুঝেছি, ওরা আমার সব কিছু ছিনিয়ে নিতে চায়। আমার পাঁজরের হাড় একটা একটা করে খুলে নিয়ে আমাকে যন্ত্রণায় উন্মাদ করে মেরে ফেলতে চায়। আমি দেবো না। আমি তোমাদের কাউকে হারাব না। বুনো চিতার মতো ওরা নিঃশব্দে ওঁত পেতে ছিল। আমার মোর্শেদ অসহায়, নির্দোষ, শক্তিহীন—

[নীচের দরজায় ঘা পড়ে]

কে কে ? দরজায় কে ধাক্কা দিচ্ছে ? তাহলে মোর্শেদকে ওরা মেরে ফেলতে পারেনি ! মোর্শেদ ফিরে এসেছে, আমার মোর্শেদ বেঁচে আছে, সে আমায় ডাকছে। তোমরা কেউ ওকে, মোর্শেদ, মোর্শেদ—

[দরজায় আরো জোরে আঘাত]

ফরিদ : আপনি অত উত্তেজিত হবেন না। স্থির হয়ে বসুন। আমি দরজা খুলে দেখছি কে এসেছে। জুলেখা তুই আব্বার কাছে এসে বোস, আমি এক্ষুনি দেখে আসছি।

[প্রস্থান]

আব্বা : জানিস জুলি, খোদার রহমত আছে আমার ওপর। এখনি দেখবি মোর্শেদ ছুটে ওপরে আসবে। ওর হাসির শব্দে এ ঘর কলকল করে উঠবে। খোকার অসুখ ভাল হয়ে যাবে, সমস্ত পৃথিবী শান্ত সুন্দর হয়ে চারদিক আলোকিত করে রাখবে।

[ফরিদের প্রবেশ]

ওকি, তুই একলা কেন ? মোর্শেদ, মোর্শেদ কোথায় ?

ফরিদ : মোর্শেদ ভাই নয়, পাড়ারই একটি লোক এসেছিল খবর দেয়ার জন্য। আমাদের এলাকায় একটা হিন্দু গুণ্ডা নাকি ঢুকেছে, সাবধান থাকতে বললো। একটু আগে বশির উকিলের ছাদে কে ওকে দেখেছে। অন্ধকারে ছাদ টপকে কোথায় পালালো কেউ ঠিক ঠাহর করতে পারল না।

আব্বা : বশির উকিলের বাড়ীর ছাদে ?

ফরিদ : হ্যাঁ। আমি বাইরে যাচ্ছি। দলবল নিয়ে সবাই খুঁজতে বার হবে। আমিও যাচ্ছি।

আব্বা : তুই যাবি ?

ফরিদ : চুপ করে বসে থাকবো ? আমি যাচ্ছি। (ড্রয়ারে হাত দেয়) পিস্তলটা রইল। হাতের কাছে রাখবেন। আমি এই ছোরাটা সংগে নিয়ে গেলাম।

জুলেখা : ভাইয়া তুমি যেও না।

আব্বা : ছোরা ? ছোরা কেন ? ছোরা দিয়ে তুই কি করবি ?

ফরিদ : আমার ভাইয়ের কাটা মাথা যারা ফেরী করে বেড়াতে পারে তাদের বিরুদ্ধে ছোরা তুলতে আপনি আমায় নিষেধ করেন আব্বাজান ? দুধের কচি শিশুকে যারা হত্যা করতে হাতিয়ার

তুলে ধরেছে, সে সমাজের সংগে লড়াই করতে ছোরা হাতে নিয়েছি বলে আপনি শিউরে উঠলেন? আপনার বনেদী রুচিকে কদমবুছি। আমি যাই, দোয়া করবেন।

[প্রস্থান]

[আব্বাজান নিশ্চল। জুলেখা আব্বাজানকে আঁকড়ে ধরে থাকে। আম্মা খোকাকে বাতাস করছেন। হঠাৎ যন্ত্রণাকাতর শিশুর কণ্ঠরুদ্ধ আর্তনাদ]

জুলেখা : আম্মা? আম্মা খোকা অমন ছটফট করছে কেন? খোকার কি হয়েছে আম্মাজান?

আব্বা : আমি অনেক গুণাহ্ করেছি খোদা। আমায় শাস্তি দাও, শাস্তি দাও। যত খুশি যন্ত্রণা আমায় দাও, আমি কোনো নালিশ জানাবো না। মোর্শেদ যদি তোমার কাছে কোনো দোষ করে থাকে, তাকে শাস্তি দাও, আমি মাথা পেতে নেবো, একটুও প্রতিবাদ জানাবো না। কিন্তু ঐ কচি শিশু নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক মায়ের কোল থেকে এখনও পৃথিবীতে নামেনি। ওতো কোনো অপরাধ করেনি, তুমি কোন ইনসাফে ওকে শ্বাস বন্ধ করে মারতে চাও! ওকে মুক্তি দাও। শান্তি দাও। রেহাই দাও—বাঁচাও। বাঁচাও ওকে তুমি বাঁচাও খোদা!

[দু'হাতে মুখ গুঁজে টেবিলে উপুড় হয়ে পড়ে থাকে। আম্মাজান নিশ্চল। জুলেখা ফুঁপিয়ে কাঁদে।]

[হঠাৎ পেছনের কাঁচের জানালার ওপর বা'র থেকে কোনো ভারি জিনিসের কয়েকটা আঘাত পড়ে। একটা কাঁচ ঝনঝন শব্দে ভেঙ্গে পড়ল]

আব্বা : কে? (হাত দিয়ে পিস্তল চেপে ধরেন)

[ভাঙ্গা কাঁচের ভেতর দিয়ে হাত গলিয়ে ক্ষিপ্রহস্তে ছিটকানি খুলে, জানালা টপকে ঘরে প্রবেশ করে এক যুবক। শেড দেয়া টেবিল ল্যাম্পের স্বল্পালোকে দেখা গেল লোকটার হাতে একটা কালো চামড়ার ব্যাগ, গায়ে ঢোলা পাঞ্জাবী, পরণে ধুতি।]

আব্বা : (কাঁপা হাতে পিস্তল তুলে) কে, কে তুমি?

লোকটা : আমি মানুষ।

আব্বা : মানুষ?

লোকটা : মানুষ, হিন্দু।

আব্বা ঃ বশির উকিলের বাড়ীর ছাদে ওরা তাহলে তোমাকেই দেখেছিল ?

লোকটা ঃ হয়ত। হঠাৎ দাঙ্গা শুরু হয়ে যাবে ভাবিনি। বন্ধুর বাড়ীতে গিয়েছিলাম, প্রয়োজনে। গিয়ে আর বেরুতে পারিনি।

আব্বা ঃ এখন বেরুলে কোন সাহসে ?

লোকটা ঃ আপনি আমায় বিশ্বাস করতে পারছেন না। বেরিয়েছি বাধ্য হয়ে। বন্ধুর সাহসে কুলোলো না আমায় জায়গা দেয়। বন্ধুকে ছেড়ে তাই ছাদ টপকে বেরিয়ে পড়লাম নিরাপদ জায়গার খোঁজে।

আব্বা ঃ বন্ধুর বাড়ীর চেয়ে এটা বেশী নিরাপদ এ আশ্বাস তোমায় কে দিয়েছে ?

লোকটা ঃ আমি আশ্রয় দাবী করছিনা। প্রার্থনা করছি। অন্য উপায় নেই।

আব্বা ঃ বাইরে দাঁড়িয়ে আরও কিছুক্ষণ কান পেতে শুনলে এ ভুল তুমি করতে না।

জুলেখা ঃ আব্বা, আব্বা, তোমার হাত কাঁপছে। গুলি ছুটে যেতে পারে।

আব্বা ঃ (একটু একটু করে এগুতে থাকে) হয়ত যখন তুমি জানালা ভেঙ্গে প্রাণ বাঁচাতে আমার ঘরে ঢুকেছো, ঠিক তখনই হয়ত তোমার কোনো পরম আত্মীয় আমার বড় আদরের ছেলে মোর্শেদকে ছুরির মাথায় গেঁথে নাচাচ্ছে। বিলাসী বেড়াল যেমন অসহায় ইঁদুরকে নখের আঁচড়ে একটু একটু করে কুরেকুরে মারে—। আর আমার খোকা—

[খোকা ও মায়ের আর্তনাদ। বেদনাযুক্ত ভয়ার্ত]

লোকটা ঃ ও কি ? উনি ওরকম করে বিছানার ওপর লুটিয়ে পড়লেন কেন ?

জুলেখা ঃ আব্বা, আব্বা, খোকা জানি কেমন করছে ?

লোকটা ঃ খোকার কি হয়েছে ? অসুখ ?

আব্বা ঃ হ্যাঁ, অসুখ। মরণ অসুখ। গত আধ ঘন্টা থেকে ছটফট করছিলো, এখন হয়ত শান্তি লাভ করলো।

লোকটা ঃ কি বলছেন আপনি ? দেখি জায়গা ছাড়ুন, (পিস্তলটা সরিয়ে) একটু পথ দিন। আমি দেখছি।

আব্বা ঃ তুমি, তুমি ? তুমি কি দেখবে ? ওহ বুঝেছি তোমাদের এখনও আশ মেটেনি। আমার খোকাকে বুঝি নিজ হাতে নিয়ে যেতে ওরা তোমাকে পাঠিয়েছে ?

লোকটা ঃ আপনি অপ্রকৃতস্থ। সরে দাঁড়ান। (সকলের স্তম্ভিত দৃষ্টির সামনে দিয়ে নীরবে এগিয়ে গিয়ে লোকটা খোকার পাশে বসে। হাতের কালো ব্যাগটা খুলে ডাক্তারী সরঞ্জাম বের করে পরীক্ষা করতে থাকে) ভয়ের কোনো কারণ নেই মা। খুব সময়মত এসে পড়েছি। কণ্ঠনালীর উদ্ধৃত্ত মাংসপিণ্ড হঠাৎ ফুলে গিয়ে মাঝে মাঝে শ্বাস বন্ধ করে দিতে চাইছে। আমি একটা উত্তেজক ওষুধ দিচ্ছি। আর একটা ইনজেকশন দেব। এক্ষুণি সব ভাল হয়ে যাবে। কিছু ভাববেন না।

আব্বা ঃ ইনজেকশন ?

(লোকটা চামচ দিয়ে ওষুধ খাওয়ালো। স্পিরিট দিয়ে তুলো ভিজিয়ে সুঁচ সেঁকে নেয়। সংলাপ চলতে থাকে, কখনো জুলেখা, কখনও আব্বা, কখনও আম্মা লোকটাকে টুকটাক সাহায্য করে)

লোকটা ঃ এই যন্ত্রগুলো দেখে অন্ততঃ আমায় বিশ্বাস করতে পারেন। আমি এখনও পুরোদস্তুর পেশাদার ডাক্তার হইনি। সবেমাত্র পাশ করেছি। বন্ধুর বাড়ি এসেছিলাম রোগী দেখতে। আশা করিনি এক রাতের মধ্যেই দু দু'জন রোগীর চিকিৎসা করতে হবে। (ইনজেকশন ঠিক করে নেয়) এখন আর কোন ভয় নেই মা। দেখবেন ভাইটি আমার খলখল করে হেসে উঠবে।

আব্বা ঃ বাঁচবে, না ? কোন ভয় নেই, না ? খোদা, অপরিসীম তোমার করুণা, তুমি এ গুনাহগারের ডাক শুনেছ। অবুঝ শিশুর ওপর আর কি তুমি ইনসাফ না করে পার ? তোমার শুকর গুজারী করি।

লোকটা ঃ আমায় একটু হাত ধোয়ার সাবান-জল দিতে হবে।

আব্বা ঃ এস, আমার সঙ্গে এস। এইদিকে বাথরুমে চল।

(আব্বা ও লোকটার প্রস্থান। সঙ্গে সঙ্গে বাইরের দরজায় দ্রুত করাঘাত ও ফরিদের চিৎকার—জুলেখা, জুলেখা)

জুলেখা ঃ আসছি ভাইয়া।

ফরিদ ঃ (নেপথ্যে) শিগগির, দরজা খোল শিগগির।

জুলেখা ঃ আম্মা, ভাইয়া যদি—

আম্মা ঃ কোন ভয় নেই, তুই দরজা খুলে দে।
(জুলেখা বেরিয়ে যায়। ও একটু পরেই উত্তেজিত ফরিদকে নিয়ে প্রবেশ করে)

ফরিদ ঃ আম্মা, আব্বাজান কোথায় গেলেন ?

আম্মা ঃ গোসলখানায়। কেন কি হয়েছে ?

ফরিদ ঃ সে হিন্দুটাকে নাকি, আমাদের বাড়ীর ছাদের খুব কাছেই কোথাও একবার দেখা গিয়েছিল। সবাই সন্দেহ করছে, ও নিশ্চয়ই আমাদের বাড়ীতেই কোথাও লুকিয়ে আছে।

আম্মা ঃ বলে দাও, নেই।

ফরিদ ঃ ওরা বিশ্বাস করতে চায়না। একেবারে ক্ষেপে উঠেছে। আমার হাতের ছুরি ওদের দেখিয়েছি, কসম কেটে বলেছি আমি মোর্শেদ ভাইয়ের ছোট ভাই। তার রক্তক্ষরণের জবাব দিতে আমি কসুর করব না।

আম্মা ঃ আমার ঘরের জিনিস লন্ডভন্ড করে বাইরের লোককে এখানে খানাতল্লাসী চালাতে আমি কখনও অনুমতি দেবো না। বলে দাও, আমরা পাহারা দিচ্ছি এ বাড়ীতে কেউ ঢোকেনি।

ফরিদ ঃ ওরা নিজেরা না দেখে কিছুতেই সন্তুষ্ট হবে না। ভদ্রলোকের কথায় ওরা বিশ্বাস করতে রাজী নয়। ওদের বাড়ী তল্লাস করতে না দিলে ওরা গোলমাল বাধাবে। বিপদ ঘটবে। সব বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে।

আম্মা ঃ বেশ। ওদের ডেকে নিয়ে এসো। খুঁজে দেখে যাক কাউকে বের করতে পারে কি না।

ফরিদ ঃ আপনি তাহলে একবার অন্য ঘরে—

আম্মা ঃ না পর্দা করবার জন্য আমি অন্য ঘরে যেতে পারবো না। এখানেই থাকব। মশারীটা ফেলে দাও। আমি ভেতরে থাকব। আমি ছোট খোকার কাছে থাকব।

ফরিদ ঃ (গোসলখানার পথে পা বাড়িয়ে)
আমি তাহলে আব্বাকে ডেকে নিয়ে আসি।

আম্মা ঃ না, না। তুমি বাইরে যাও। একটু পর ওদের ভেতরে নিয়ে আসবে। আমরা ততক্ষণে ঘরটা গুছিয়ে নিচ্ছি। যত খুশি এসে দেখে যাক, হিন্দু খুঁজে পায় কিনা। জুলেখা তোমার আব্বাকে ডেকে দেবে। তুমি বাইরে যাও। (বলতে বলতে আম্মা নিরুদ্বেগ চিত্তে মশারী ফেলছেন। গোসলখানার

দরজা দিয়ে লোকটার হাত ধরে উত্তেজিত ভয়ার্ত আব্বাজানের প্রবেশ)।

আব্বা ঃ আমরা সব শুনেছি। এ তুমি কি করলে ? কেটে কুচি কুচি করে ফেলবে। এঁকে আমি এখন কোথায় লুকিয়ে রাখি? কিন্তু এঁকে আমি রক্ষা করবই। এঁকে আমি মরতে দেব না। এঁকে বাঁচাব। বাঁচাব, হ্যাঁ। এই ধরো আমার পিস্তল, মুঠ করে ধরো। যে তোমাকে মারতে চাইবে তাকে মারবার অধিকার তোমারও আছে। না লড়ে মরবে কেন ?

আম্মা ঃ (ভাল করে চারপাশে মশারী গুঁজে দেয়।) অত উত্তেজিত হয়ো না তুমি। আমি যা করেছি, ঠিকই করেছি। (হাত দিয়ে নেড়ে টেবিল ল্যাম্পটার শেড ঠিক করে নেয়।) ডাক্তার তুমি আমার সঙ্গে এস। এই মশারীর মধ্যে তুমি আমার সঙ্গে থাকবে। শেড দেয়া টেবিল ল্যাম্পটার এই আলোর জন্য বার থেকে মশারীর ভেতরে কিছুই স্পষ্ট দেখা যাবে না। ঘরের বড় আলোটা নিভিয়ে দাও। তোমার কোন ভয় নেই। শরীফ খান্দানের পর্দানশীন মহিলা আমি মশারীর ভেতর থেকে একবার কথা বললেই যথেষ্ট। কেউ মশারী তুলে উঁকি দিয়ে দেখার প্রস্তাব করতে সাহস করবেনা।

লোকটা ঃ মা।

আম্মা ঃ দেরী করোনা। ওদের পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। উঠে এস শিগগির। (প্রথমে আম্মাজান, পরে লোকটা মশারীর ভেতর অদৃশ্য হয়ে যাবে। আব্বা ও জুলেখা বাকহীন। ঘরে প্রবেশ করলো ফরিদ, অনুসরণ করে আরো কয়েকজন লোক। ঘরে ঢুকেই তারা বিনা ভূমিকায় এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ে। এ দরজা দিয়ে যায় ও দরজা দিয়ে আসে। হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠে। কিন্তু সেই শব্দ এই অদ্ভুত পরিস্থিতির মানুষগুলোকে যেন একটুও সচকিত করে তুলছে না।)

আম্মা ঃ (মশারীর ভেতর থেকে) তোমরা কেউ ফোনটা ধরছো না কেন ? দেখ কে ডাকছে ? কি বলছে ? তোমরা কেউ ফোনটা ধর, হয়ত কেউ মোর্শেদের কোনো খবর জানাতে চাইছে।

আব্বা ঃ ধরছি, আমি ধরছি। হ্যালো, ইয়েস বলুন। হ্যাঁ, আমি মোর্শেদের বাবা।

(কি যেন শুনলেন। চোখমুখ হঠাৎ শিটিয়ে পাথরের মূর্তির মত নিথর হয়ে গেল। ফোনটা নামিয়ে রেখে তেমনি দাঁড়িয়ে রইলেন। ততক্ষণে পাড়ার লোকেরা গৃহতল্লাশ শেষ করে একে একে বেরিয়ে যাচ্ছে। যাবার সময়—)

একজন : সব ঠিক আছে। কেউ নেই। সালাম সাহেব।

(সকলের প্রস্থান)

জুলেখা : আব্বা! তুমি অমন করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? আব্বা কিছু বলো। অমন করে চেয়ে থেকো না, আমার ভয় করছে। আব্বাজান, ফোনে কে ডেকেছিল? কি বললো?

আব্বা : হাসপাতাল থেকে ফোন করেছিলো।

ফরিদ : জুলি আমার কাছে আয়। ভয় পাসনে, আব্বাজানকে অমনি থাকতে দে।

(আম্মাজান বেরিয়ে আসেন। মশারী তুলতে থাকেন।)

ফরিদ : আম্মা। এ কে?

লোকটা : আমায় বলছ ভাই? আমি মানুষ। (আম্মাকে) ছোট খোকার আর কোনো ভয় নেই মা। দেখুন খেলতে শুরু করেছে। খোকাকে আমি দেখছি। আপনি (আব্বার দিকে ইংগিত করে) ও‍ঁকে দেখুন। (জুলেখা তখন ফরিদের বুকে মাথা রেখে ডুকরে কাঁদছে। আব্বাজান তেমনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন। চোখে উন্মাদের দৃষ্টি। আম্মাজানের শান্ত কালো চোখ আব্বার মুখের ওপর ন্যস্ত, একটু একটু করে তা পানিতে ভরে উঠছে। লোকটা ছোট খোকার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে ওর কপালে হাত রাখে।

[মঞ্চ আস্তে আস্তে অন্ধকার হতে থাকে ও ধীরে ধীরে পর্দা নেমে আসে]

য ব নি কা

রাত জেগে নাটক লিখে ক্লান্তিতে চোখ বুঁজে আসে। ঘুম নয়, জ্বালা করে চোখ। তখনো ভোর হয়নি, আজানের শব্দ ভেসে আসছে। নাটকের উত্তেজনায় শুতে ইচ্ছে করেনা, দরজা খুলে বাইরে আসে।

এক ঝলক হিমেল হাওয়া পরশ বুলিয়ে যায়। আগে এই ধরনের স্পর্শে বাবার কথা মনে হতো এখন হয়না। সরকারী চাকুরের আভিজাত্য এবং দম্ভ বাবার মজ্জাগত। কিন্তু গতকাল নাদেরা যে ঘটনা বলেছে তাতে বাবার স্নেহের ফল্গুধারা আজ এই মুহূর্তে ওকে অন্যরকম করে দিচ্ছে। বাবার বিরুদ্ধে যে অনমনীয় মনোভাব, এই ঠাণ্ডা হাওয়া যেন সেই গতরে শীতল স্পর্শ। বাবা এখন দম্ভ এবং স্নেহের নিষ্পেষণে দ্বিধান্বিত। খোলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে একা একাই হো-হো করে হাসে মুনীর। এই বাবাকেই কি ও নাটকে রূপ দিলো? কিছুদিন আগে 'বাবা ফেকু' নামে একটি গল্প লিখেছিলো। সে গল্প পড়ে নাকি বাবার সহকর্মীর মেয়ে নাসিমা চিঠিতে আবদুল হালিম চৌধুরীর কাছে অভিযোগ করেছে যে মুনীর তার বাবাকে নিয়ে ব্যঙ্গ করেছে। হালিম চৌধুরী উত্তরে লিখেছেন, 'গল্পটি পড়ে আমার মনে হয়েছে মুনীর বুঝি আমাকেই ব্যঙ্গ করেছে? এখন দেখছি গল্পটি যখন অন্যদেরও আহত করেছে তাহলে বুঝতে হবে লেখাটি ভালো হয়েছে।'

এই ঘটনা বলে নাদেরা হেসে গড়িয়ে পড়েছে।

বাবা তোমাকে যতই দূরে রাখুক, তোমার দিকেই বাবার নজর বেশি বলে মনে হয়। নইলে খুঁটিয়ে লেখা পড়বে কেন? উত্তরটাই বা এভাবে দেবেন কেন? ঠিক বলি নি?

হবে হয়তো।

মুনীর এখন ভোরের বাতাসে বাবার কাছে ফিরে যায়। কমিউনিষ্ট ছেলেকে তিনি ক্ষমা করেননি, ক্ষমা ও চায়না। কিন্তু বাবাকে প্রতি মুহূর্তে সচেতন রাখতে পেরেছে এটাই ওর বড় লাভ।

৮

সাতচল্লিশের চৌদ্দই আগষ্ট। দেশ ভাগ হয়ে গেলো। নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তান, নতুন পতাকা পতপত উড়ছে। চারদিকে মানুষের উল্লাস, মাইকে গান বাজছে, আতশবাজি পোড়ানো হচ্ছে। স্বাধীন দেশের মাটিতে মানুষের মনে নতুন আশা, নতুন উদ্দীপনার জোয়ার।

জি. ঘোষের গলিতে প্রতিরোধ পাবলিশার্সে'র অফিসে বসে মুনীর অনিল মুখার্জি'র 'সাম্যবাদের ভূমিকা' বইটি পড়ে। 'প্রতিরোধ পাবলিশার্স' বেশ কয়েকটি বই বের করেছে। সংঘের কাজ ভালভাবেই

চলছে। কিছুদিন আগে পুরানা পল্টনের এক বাড়িতে সংঘের সাহিত্য সভা হয়। সভাপতিত্ব করেছিলেন প্রফেসর সত্যেন্দ্রনাথ বসু। মুনীরের মনে হয়েছিলো একজন বিজ্ঞানীর সাহিত্যের ওপর বক্তৃতা তার জীবনের এক চমৎকার অভিজ্ঞতা। এখনো যেন কানে বাজে সেই কন্ঠ। পাঁচ বছর আগে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 'শিল্পীর দায়িত্ব' শীর্ষক অভিভাষণ পাঠ করেছিলেন। তরুণ বয়সে শোনা সেই প্রবন্ধটি এখনও মনে পড়ে। মনে পড়ে হবীবুল্লাহ বাহারের বক্তৃতা। কিছু কিছু জিনিস বোধ হয় এমন করে বুকে আটকে থাকে। কিছুতেই বিস্মৃত হয়না। কয়েক পৃষ্ঠা পড়ার পর 'সাম্যবাদের ভূমিকা' আর পড়া হয়ে ওঠেনা। কাগজের ওপর স্কেচ করতে থাকে। বুকের মধ্যে দারুণ শব্দ, কলরোল প্রবল গর্জনে কেবলই উর্ধগামী। ভালোবাসা কি এমনই ? কখনো বিচ্ছিন্ন করে ফেলে পারিপার্শ্বিক ভুবন থেকে ? নিয়ে যায় গোপন অন্দরে, মুখোমুখি করিয়ে দেয় একটি শব্দের অজস্র দ্ব্যর্থক বোধে। কেবলই বলতে ইচ্ছে করে ভালোবাসি। ভালোবাসি। মুনীরের এখন তেমন অবস্থা। কলমের নিচে আর স্কেচ হয় না। শুধু উঠে আসে একটি নাম, লিলি মীর্জা। আত্মমগ্ন নিমগ্নতায় মুনীরের সামনে কারো কোন উপস্থিতি নেই। গালে হাত দিয়ে অখন্ড মনোযোগে কাগজের বুকে নামের আঁকিবুকি করে। হৃদয়ে শেক্সপীয়রের ব্যাকুল শব্দরাজি নায়েগ্রা জলপ্রপাতের মতো পড়ে।

What you do,
Still betters what is done. When you speak,
Sweet,
I'd have you do it ever ; when you sing,
I'd have you buy and sell so ; So give alms ;
Pray so ; and, for the ordering your affairs,
To sing them too ; when you do dance, I
wish you
A wave o'the sea, that you might ever do
Nothing but that ; move still, still so, and
Own
No other function : each your doing,
So singular in each particular,

Crowns what you are doing in the present deeds,
That all your acts are queens.

লিলি মীর্জা নামের নিচে শেষের লাইনটি বারবার লিখতে থাকে। যেন একটা স্বপ্নের ভেতর দিয়ে হেঁটে যাওয়া। এম.এ. পাশ হয়ে গেছে। হাতে অফুরন্ত সময়। এখন শুধু পাঠ। পাঠে নিমগ্ন চিত্ত ঝংকৃত পদশব্দ শুনতে পায়। তখন ভেঙে যায় ধ্যান। মনে হয়,

Here will we sit and let the sounds of music
Creep in our ears; soft stillness and the night
Become the touches of sweet harmony.

দুপুরে মানুষের আনন্দ উচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়ে পথে হাঁটতে হাঁটতে নিজের হৃদয় খুলে দেয়, ইচ্ছে করে চেঁচিয়ে শেক্সপীয়র আবৃত্তি করতে। আবেগ ঢেলে দিয়ে মুক্তি পেতে চায়, ভালোবাসার মুক্তি। দুপুরের রোদে পথে দীর্ঘ ছায়া পড়ে, নিজের ওপর প্রচন্ড ভালোবাসায় পদক্ষেপ দ্রুত হয়। ভালোবাসা সিদ্ধান্তের মনস্থিরে, নিজেকে নিজেই শোনায়, মেয়েটি বড় ভালো অভিনয় করে এবং নাচে। পরক্ষণে নিজের মনেই হাসে মুনীর। শুধু কি তাই? আরো তো বাড়তি কিছু আছে। আছে টানা আয়ত চোখের অতলান্তিক গভীরতায় অমৃতের কলস উপুড় করা, এক জীবনের পরিধিতে তা কখনো হলাহলে রূপান্তরিত হবে না। গভীর বিশ্বাসে বুক ভরে শ্বাস নিলে মাথার ওপরের রেনট্রি'র বিশাল ছায়া পড়ন্ত বিকেলের স্নিগ্ধ আলো হয়ে হৃদয় ভরিয়ে রাখে।

পাকিস্তানের জন্ম-উৎসবের রেশ একসময় শেষ হয়। সাধারণের মনে তখনো ঘোর, শিক্ষিতরা বিভিন্নভাবে নতুন রাষ্ট্রের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করছে। দ্বিধা-সংশয় কাটে না। রাষ্ট্র মানে কি শুধু ধর্মীয় বন্ধন? এর জন্যে তো প্রয়োজন নির্দিষ্ট ভৌগলিক সীমারেখার সঙ্গে সঙ্গে আবহমানকালের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার, নদীর মতো অবিরাম পলিমাটি ফেলে দু'কূল উর্বর করা ভাষা, অস্থি-মজ্জায় পেশল সুদৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তিভূমি। শুধু ধর্মীয় উন্মাদনা দিয়ে একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠিকে ভাসিয়ে নেয়া যায়, একপেশে স্রোতের বিপুল আবেগ তৈরি করা যায়, কিন্তু স্থায়িত্ব দেয়া যায় কি? ইতোমধ্যেই স্বার্থের কোন্দল বেঁধে

গেছে। ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাবে বলা হয়েছিলো মুসলিম সংখ্যা-গরিষ্ঠ অঞ্চলসমূহ নিয়ে সভরেণ ও ইনডিপেনডেন্ট স্টেটস গঠিত হবে। কিন্তু স্বাধীনতার পর উল্টো চিন্তা ভাবনা হচ্ছে। নেতারা ভাব-ছেন মুসলমানদের আবাসভূমি পাকিস্তান হবে এক রাষ্ট্র, এক ভাষা ও এক সংস্কৃতির দেশ। কি ভাবে ? ভাবলে রক্ত গরম হয়ে যায়। এইসব ভাবনা নিয়ে বামপন্থী সংগঠনের কর্মীরা ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর এক কর্মী সম্মেলন আহ্বান করে। সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় মিউনিসিপ্যালটির চেয়ারম্যান খান সাহেব আবুল হাসনাতের বাসায়। এই সম্মেলনে অসাম্প্রদায়িক যুব প্রতিষ্ঠান পূর্ব পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগ জন্ম-লাভ করে। ঘোষণাপত্রে বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের আইন আদালতের ভাষা এবং শিক্ষার বাহন হিসেবে গ্রহণ করার জন্যে দাবি করা হয়। পেছন থেকে কে যেন বলে, রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে ? রাষ্ট্র-ভাষার ব্যাপারটি গণ-পরিষদ বিবেচনা করবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

জম-জমাট কর্মী সম্মেলন। রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর সব জায়গা থেকে কর্মীরা এসেছে। সবার মনে উদ্দীপনার জোয়ার। নতুন রাষ্ট্রে তারা আত্মবিকাশের পথ পাবে, সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা নিশ্চিত হবে, গণমুক্তির শুভ উদ্বোধন সূচিত হবে। জোরালো বক্তৃতা করেন শহীদুল্লা কায়সার, তাজউদ্দীন আহমদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, শামসুল হক এবং আরো অনেকে। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক চেতনার সমৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচী গৃহীত হতে থকে। দেশের খ্যাতিমান চিত্রশিল্পী জয়নুল আবেদিনকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করার কথা অনেকের মনেই ঘোরাফেরা করছে। বিশেষ করে দুর্ভিক্ষের সময় আঁকা তাঁর শিল্পকর্ম তখনো অনেকের চেতনায় আশ্চর্য জীবন্ত। এ ব্যাপারে এগিয়ে আসে পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ। তারা ৬ নভেম্বর ফজলুল হক মুসলিম হলের মিলনায়তনে জয়নুল আবেদিনের সম্বর্ধনার আয়োজন করে। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন। একই সঙ্গে শিল্পীর একক চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে শওকত ওসমান নাটিকা এবং আবু রুশদ গল্প পড়েন। আজাদ সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন, শইখ শরফুদ্দিন, কিরণ-শঙ্কর সেনগুপ্ত, সরদার ফজলুল করিম, মনসুরউদ্দিন, আবুল হাসনাৎ, আবু জাফর শামসুদ্দীন বাংলা ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করার দাবি জানান এবং শিল্পী জয়নুল আবেদিনের শিল্পকর্মের ওপর বক্তৃতা দেন।

পুরো অনুষ্ঠানটি মুনীর এবং রণেশের খুব ভালোলাগে। দু'জনেরই মনে হয় অনেকদিন পর বেশ কতগুলো ভালো বক্তৃতা শুনলো। বিশেষ করে মুনীরতো জয়নুল আবেদিনের ব্যাপারে সবসময় উচ্ছ্বসিত। আজও দেখতে এসেছে। এখনো আলাপ হয়নি। রণেশ বলেছে, সুযোগ পেলে আলাপ করিয়ে দেবে।

পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করার জন্য এবং অবিলম্বে পূর্ব পাকিস্তানের শ্রেষ্ঠ শিল্পীর পরিচালনাধীনে পূর্ব পাকিস্তানে একটা আর্টস্কুল স্থাপনের জন্য গভর্নমেন্টকে অনুরোধ জানিয়ে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে দু'টি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সভা শেষ হয়ে যাবার পরও অনেকে জয়নুল আবেদিনকে ঘিরে থাকে। নানা ধরনের আলাপ আলোচনা হয়। রণেশ আর মুনীর ইতস্তত ঘোরে। অনেকের সঙ্গে দেখা হয়, কথা হয়। কিন্তু জয়নুল আবেদিনের সঙ্গে পরিচিত হবার তেমন সুযোগ হলোনা।

আজকে বোধহয় আর আলাপ করা যাবে না মুনীর।

আমারও তাই মনে হয়। তাছাড়া শুধু পরিচয়ের পর্বে আমার হবে না। আমি দীর্ঘক্ষণ কথা বলতে চাই।

তাহলে আজ চলো, আর একদিন হবে।

মনের ইচ্ছে মনে চেপে মুনীরকে সভা স্থান ত্যাগ করতে হলো।

কর্মী সম্মেলনের সাফল্যের পর পরই 'তমুদ্দুন মজলিস-'এর পক্ষ থেকে 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু?' এই শিরোনামে পুস্তিকা বের করা হয়। মজলিসের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আবুল কাসেম বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান। আবুল মনসুর আহমেদ ও ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা করার পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে নিবন্ধ লেখেন। শীতের দুপুরে পুস্তিকাটি পড়তে পড়তে মুনীরের মেজাজ খচে যায়। স্বাধীনতার আগ থেকেই আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর জিয়াউদ্দিন আহমেদ উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করার স্বপক্ষে ওকালতি শুরু করেছিলেন। প্রতিবাদ করেছিলেন ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। জুলাই মাসের 'আজাদ' পত্রিকায় তা ছাপা হয়েছিলো। বইয়ের র‍্যাক থেকে পত্রিকাটা খুঁজে পেতে বের করে মুনীর। লেখাটি আবার পড়ে। চমৎকার জোরালো বক্তব্য, যুক্তি এবং আবেগের অপূর্ব সমন্বয়।

আগেও পড়া ছিলো লেখাটি, নতুন করে পড়তে বসে আরো ভালো-লাগলো। তখনই ওর মনে হয় একটা চক্রান্ত শুরু হয়েছে। ভাষা দিয়ে শুরু হলেও এর মূল আরো গভীরে। শুধু সাংস্কৃতিক অধিকার হরণ করেই কোনো শোষক নিশ্চুপ থাকে না, তার ডালপালা ছড়িয়ে দেয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে। ওর কাছে পরিষ্কার মনে হয় পূর্ব বাংলার ওপর ঘনীভূত হয়ে উঠছে পশ্চিম পাকিস্তানীদের নতুন পন্থায় ঔপনিবেশিক শাসন আর শোষণ ব্যবস্থা। একে রুখতে হবে, নিজের অজান্তেই শ্লোগানের মতো করে বলে ওঠে।

কিছুদিন পরই এক শীতের সকালে 'মর্নিং নিউজ' পত্রিকার একটি বিশেষ খবর পড়ে মেজাজ তিরিক্ষে হয়ে যায়। খবরে বলা হয়েছে, করাচীতে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র-ভাষা হিসেবে গ্রহণ করার সুপারিশ করা হয়েছে। একটি স্ফুলিঙ্গ মাত্র, দাউদাউ জ্বলে ওঠে সর্বত্র। ঐ দিনই বেলা দু'টোয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অধ্যাপক আবুল কাসেমের সভাপতিত্বে ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। মুনীর চৌধুরী বক্তৃতা করে, যেন এটা ডিসেম্বরের শীতের দুপুর নয়, এখানে কখনো বর্ষা আসেনা, কালোমেঘের ভারে আকাশ নত হয়ে থাকেনা, এখানকার জলবায়ু মুনীর চৌধুরীর গমগমে কন্ঠের মতো শুষ্ক, রুক্ষ এবং তাপিত। শ্রোতা বিস্ময় বিমুগ্ধে সে বক্তৃতা শোনে। এমনিতে সমসাময়িককালের শ্রেষ্ঠ বক্তা বলে তার খ্যাতি তখন তুঙ্গে, সেদিন যেন কণ্ঠ অনুকূল হাওয়া পেয়ে ফুলেফেঁপে উঠছিলো বারবার। বলছিলো, আমাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের বিরুদ্ধে এ এক সুস্পষ্ট চক্রান্ত। ওরা জানে সাংস্কৃতিক দিক থেকে পঙ্গু করে ফেলতে পারলে একটি জাতির স্বকীয়তা বিনষ্ট করে দেয়া যায়। যে কারণে সোমেন চন্দকে মরতে হয়, যে কারণে দাঙ্গা বাঁধে, যে কারণে তেভাগা আন্দোলন দমনের নিষ্পেষণ চলে, সেই একই কারণে মাতৃভাষাকে অমর্যদা করা হয়। কোনোটাই বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়।

বক্তৃতা চলে অনেকক্ষণ। আরো অনেকে বক্তৃতা করেন। কিন্তু জীবন্ত, প্রাণবন্ত মানুষের মুখচ্ছবি হয়ে মুনীর শ্রোতার হৃদয়ে মুদ্রিত হয়ে যায়। সভায় প্রস্তাব পাঠ করে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ইউনিয়নের সহ-সভাপতি ফরিদ আহমদ। প্রস্তাবে পরিষ্কারভাবে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করার দাবি উত্থাপন করা হয় এবং তা সর্ব-সম্মতিক্রমে পাশ হয়। সভাশেষে ছাত্রদের বিরাট মিছিল প্রাদেশিক

কৃষিমন্ত্রী সৈয়দ আফজালের বাসবভনে যায় এবং তার সঙ্গে দেখা করে। তারা নূরুল আমিন এবং খাজা নাজিমুদ্দিনের বাসভবনে গিয়ে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার সমর্থনে তাঁদের মতামত চায়। ছাত্রদের চাপের মুখে তাঁরা স্বীকার করেন যে তাঁরা গণ-পরিষদে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি সমর্থন করবে। শুধু হামিদুল হক চৌধুরীর সঙ্গে ছাত্র-প্রতিনিধিদের বেশ কথা কাটাকাটি হয় এবং তিনি ছাত্রদের দাবি সমর্থন করবেন না বলে মত প্রকাশ করেন। বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা ফিরে আসে।

১২ ডিসেম্বর ছাত্র-নামধারী গুণ্ডারা ট্রাকে করে পলাশী ব্যারাক ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হোস্টেলে হামলা চালায়। খবর শহরে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা পলাশী ব্যারাক, নীলক্ষেত ইত্যাদি এলাকার সাধারণ মানুষ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রাঙ্গণে সমবেত হয়। সেখান থেকে বিরাট মিছিল শিক্ষা মন্ত্রী আবদুল হামিদের বাসভবন ঘেরাও করে। নেতারা তাঁর কাছে গুণ্ডামি বন্ধের দাবি জানায়। আবদুল হামিদের পরণে লুঙ্গি, গায়ে পাঞ্জাবি। উত্তেজিত জনতার সামনে কিছুটা বেসামাল। নেতারা প্রশ্ন করে, কেন মনিঅর্ডার ফর্ম এবং ডাকটিকিটে উর্দুর সঙ্গে সঙ্গে বাংলাকে রাখা হয় নি ?

আমতা আমতা করেন আবদুল হামিদ। জোরগলায় বড় কিছু বলার সাহস নেই। জনতা তাকে নিয়ে মিছিল করে সেক্রেটারিয়েটে যায়। সেখানে কৃষি মন্ত্রী সৈয়দ আফজালের সঙ্গেও দেখা করে। তাঁদের কাছ থেকে লিখিত প্রতিশ্রুতি আদায় করে যে তাঁরা বাংলা ভাষার দাবিকে সমর্থন জানাবে।

ছাত্র-জনতার ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে আন্দোলন সুস্পষ্ট রূপ নিতে শুরু করে। এর মধ্যে ডিসেম্বরের শেষের দিকে 'মর্নিং নিউজ' সম্পাদকীয়তে বলে যে, পাকিস্তানের শত্রুদের দ্বারা প্ররোচিত হয়েই ছাত্ররা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলন করছে। যারা এমন দাবি করছে তারাও রাষ্ট্রের দুশমন। বিশেষ করে কমিউনিস্টরা এ ব্যাপারে উস্কানি দিচ্ছে বেশি। এর ফলে পাকিস্তানের স্থায়িত্ব বিনষ্ট হবে। পার্টি অফিসে বসে সেদিনের কাগজ পড়ে রণেশ মৃদু হাসে, কি বুঝলে মুনীর ?

পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি সুকৌশলে উর্দুকে পূর্ব বাংলার মানুষের ওপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা হচ্ছে।

আর একটি জিনিস লক্ষ্যণীয়।

কি ?

আমাদের ওপর নির্যাতনের স্টীমরোলার চালাবে।

মুনীর কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর বলে, ওরা আরো বলছে কমিউনিস্টরা ভারতীয় চর।

দিশে হারিয়ে ফেললে শোষক শ্রেণী এমন প্রলাপই বকে।

মুনীর হো-হো করে হাসে।

আপনি বড় ঠাণ্ডা মাথায় কথা বলেন রণেশদা। তবে একটা জিনিস আমি সহজেই বুঝতে পারছি যে ওরা সহজে ছাড়বেনা, বাংলা ভাষার সংগ্রাম বেশ দীর্ঘকালের সংগ্রাম হতে পারে।

হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়। সেজন্য সংগ্রামকে একটি সাংগঠনিক রূপ দেয়া প্রয়োজন।

দু'জনে আবার কাগজে ডুবে যায়।

সত্যেনদা এখন দিনাজপুরে না, রণেশদা ?

হ্যাঁ।

তাঁর কাছ থেকে আমার তন্নরায়ণের কথা শোনা হলোনা।

কৃষক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সত্যেনের অভিজ্ঞতার তুলনা হয় না। দিনাজপুরে এখন কম্পরামের নেতৃত্বে তোলাবাটি আন্দোলন শুরু হয়েছে।

একটু ব্যাখ্যা করে বলুন ?

কৃষক আন্দোলনের ঢেউ এখন সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রতাপশালী জমিদারেরা দীর্ঘদিন ধরে হাটে হাটে তোলা আদায় নিয়ে অকথ্য জুলুম চালাচ্ছে। জমিদারের কর্মচারীরা ক্রেতা ও বিক্রেতা দু'পক্ষের কাছ থেকেই ভারি হাতে তোলা আদায় করে। নিতান্ত গরীব মানুষ, যারা সামান্য আয় করে সংসার চালায় তারাও তাদের হাত থেকে রেহাই পায়না। কেউ প্রতিবাদ করলে মারপিট খেয়ে ঘরে ফিরে। দিনাজপুরের কৃষকরাই প্রথম জমিদারদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নামে। কৃষক সমিতির স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী হাটের দিন সারা হাটে টহল দেয় যাতে জমিদারের লোকেরা তোলা আদায় করতে না পারে। ওখানে এখন বিপুল উৎসাহ, উদ্দীপনা। সাধারণ মানুষ এক হয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে। কম্পরাম সিং লাহিড়ীহাটে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছে। কিছুদিন আগে পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করেছে। সরকার ভেবেছিলো একজন কম্পরামকে গ্রেফতার করলেই বুঝি সমস্যার সমাধান হবে। কিন্তু ফল হয়েছে

উল্টো। চাষীরা আরো ক্ষেপে গেছে। লাহিড়ীহাট ভেঙে দিয়ে কৃষক সমিতি নতুন হাট গড়ে তুলেছে। নাম দিয়েছে 'সমিতির হাট'।

দারুণ তো ?

মুনীর উত্তেজনা বোধ করে।

দমননীতি চালিয়ে কিছুই করা যায় না মুনীর, যদি জনসাধারণের মনোবল অটুট থাকে।

ঠিক বলেছেন।

চলো উঠি।

কোথায় যাবেন ?

ঘরে ফিরবো, একটা লেখার কাজ আছে।

মুনীর আড়িমুড়ি ভাঙে, শরীরে জড়তা। অলসতা পেয়ে বসেছে, ইচ্ছে হচ্ছে লম্বা একটা ঘুম দিতে। শরীরে অসুস্থতা নেই, কেমন আচ্ছন্নের মতো লাগছে।

গতকাল মোহিত একটা পত্রিকা দিয়েছিলো। খুলে দেখা হয়নি। প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা 'কাফেলা'। উল্টেপাল্টে ভালোই লাগে পত্রিকাটি। বিশেষ করে বুদ্ধদেব বসু-র চিঠিটি ওকে উদ্বুদ্ধ করে। ও মগ্ন হয়ে পড়ে।

কবিতাভবন
২০২ রাসবিহারী এভিনিউ
কলকাতা ২৯
২ আশ্বিন, ১৩৫৪

সবিনয় নিবেদন,

কলকাতার মুসলমান সাহিত্যিকরা মিলে নতুন একটি বাংলা সাপ্তাহিক বের করেছেন, এই খবর পেয়ে উৎসাহিত হয়েছি।

বলা বাহুল্য বাঙালি সাহিত্যিকদের 'হিন্দু' ও 'মুসলমান' এই দুই অংশে বিভক্ত আমি নিজের মনে কখনোই করি না; কিন্তু ঘটনাচক্র আজ এমন ঘনজটিল হ'য়ে উঠেছে যে আপাতত এই বিভাগ মেনে নিতে হলো। রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে নিষ্ঠুর বিচ্ছেদ ঘটলো বাংলাদেশের হিন্দু-মুসলমানে; এ-বিচ্ছেদ যে কত সুদূরপ্রসারী সর্বনাশে আমাদের উত্তীর্ণ করতে পারে, এখন তা আমাদের কল্পনারও অনায়ত্ত। এখনকার মতো, বিধাতার কাছে শুধু এই প্রার্থনা আমরা জানাতে পারি যে সে-সর্বনাশ যেন না ঘটে, কালক্রমে বাঙালির ঘরে যত ভাই-বোন আবার যেন এক হয়।

রাষ্ট্রিক ব্যবস্থাকে অতিক্রম ক'রে কখনও একটি মিলনের ক্ষেত্র আছে আমাদের, একটিই আছে, একটিমাত্র। সে-ক্ষেত্র আমাদের সাহিত্য, আমাদের ভাষা। একমাত্র সাহিত্যই সেই শ্রীক্ষেত্র, যেখানে জাতিভেদ নেই, দেশে-দেশে সীমান্তরেখা নেই, মানুষে-মানুষে ভেদচিহ্ন নেই। কত দূর, কত অচেনা, কত বিরোধীর পরস্পরের সঙ্গে মিলন ঘটে সাহিত্যে-আর এ তো বাংলার হিন্দু-মুসলমান। হিন্দু-মুসলমান উভয়েই যে বাংলা ভাষা বলে, এই কি তাদের ঐক্যের অলঙ্ঘ্য পরিচয় নয় ?

আমাদের এই মৌল—এবং বর্তমানে একমাত্র—মিলনক্ষেত্রও বিপন্ন হবে, যদি রাষ্ট্রভাষারূপে পূর্ববাংলায় উর্দু আর পশ্চিম বাংলায় হিন্দি স্থাপিত হয়। সে-দুর্দৈব যাতে না ঘটে, সে উদ্দেশ্যে আন্দোলন আরম্ভ করার সময় এসেছে। রাষ্ট্রব্যবস্থা যে-রকমই হোক, স্বাধীন দেশে মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য-কোনো ভাষা যে রাষ্ট্রভাষার স্থান পেতে পারে, আধুনিক জগতে এ-প্রস্তাব অচিন্ত্য। এই সংকটকালে বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে বাঁচাবার দায়িত্ব হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই। আশা করি আপনাদের পত্রিকায় এই বিষয়টিকে যথোচিত প্রাধান্য দেবেন।

'কাফেলা' সম্পাদক
সমীপেষু

বুদ্ধদেব বসু
কাফেলা, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা

মনে মনে ভাবে বুদ্ধদেব বসুকে একটা চিঠি লিখবে। একসময় পত্রিকাটি মুখের উপর রেখে ঘুমিয়ে যায়।

ডিসেম্বরের একদম শেষের দিকে রশিদ বিল্ডিংয়ে তমুদ্দন মজলিসের অফিসে ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবীদের সমন্বয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' নামে কমিটি গঠন করা হয়। আহবায়ক নিযুক্ত হন অধ্যাপক নুরুল হক ভূঁইয়া। কমিটি বাংলা ভাষা আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কর্মসূচী গ্রহণ করে। এদের উদ্যোগে ১৯৪৮-এর জানুয়ারি মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদ এবং বিজ্ঞান অনুষদের যুক্ত অধিবেশনে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে নিম্ন পর্যায় থেকে শুরু করে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা হবে। আগামী ১৯৫০-৫১-র পর থেকেই এটি কার্যকর করা হবে। এই ব্যাপারে একটি পরিভাষা কমিটি

গঠন করা হয়। ফেব্রুয়ারির প্রথম দিকে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের অভিষেক অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মাহমুদ হাসান তাঁর বক্তৃতায় বলেন, দেশের মঙ্গল ও উন্নতির জন্যে মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। এ সময় থেকেই ছাত্র-শিক্ষকের বৃহত্তর অংশ ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় হয়ে ওঠে। শুধুমাত্র অল্প কিছুসংখ্যক ছাত্র শাহ আজিজুর রহমানের নেতৃত্বে এ আন্দোলনের বিরোধিতা করে। ফেব্রুয়ারির শেষের দিকে পাকিস্তান গণ-পরিষদের অধিবেশন বসে। অধিবেশনের আগে 'সংগ্রাম পরিষদ' মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দকে অনুরোধ করে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব সমর্থন করতে। তারা তাদেরকে আশ্বাস দেয়। কিন্তু কার্যত দেখা গেলো উল্টো। ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত দু'টো সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। একটা, বছরে অন্তত একবার গণ-পরিষদের অধিবেশন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হতে হবে, অন্যটি ইংরেজি এবং উর্দুর সঙ্গে বাংলাকে পরিষদের ভাষা হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। দু'টি প্রস্তাবের বিরোধীতা করে বক্তৃতা করেন লিয়াকত আলী খান ও গজনফর আলী খান। সবাইকে বিস্মিত, হতচকিত এবং বিমূঢ় করে দিয়ে খাজা নাজিমুদ্দিন ঘোষণা করেন, পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত মুসলমান উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে পেতে চায়। 'সংগ্রাম পরিষদ' -এর কাছে দেয়া ওয়াদা তিনি বরখেলাপ করেন। বিক্ষোভে ফেটে পড়ে ছাত্র-জনতা। ২৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং অন্যান্য কলেজ ও স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা ক্লাশ বর্জন করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মিছিল করে রমনা এলাকা প্রদক্ষিণ করে খাজা নাজিমুদ্দিনের বাসভবন বর্ধমান হাউসে এসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। তিনি তখন করাচীতে। এরপর মিছিলকারীরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে সভা করে। তখন ফাল্গুনের বিকেল। আরো কিছুক্ষণ পর সন্ধ্যা নামবে। সবাই এলোমেলো, ইতস্তত দাঁড়িয়ে, ক্ষুব্ধ, উত্তেজিত। বিভিন্ন ধরনের কথায় মুখর প্রাঙ্গণ। বাতাসে মৃদু শীতের আমেজ। মুনীর অন্যমনস্ক দাঁড়িয়ে থাকে। এই পরিবেশ থেকে নিজেকে কিছুটা বিছিন্ন মনে হয়। কে যেন কি জিজ্ঞেস করলো, ও অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়ে। উত্তরটা সঠিক দেয়নি তা তলিয়ে দেখেনা। এক সময় এই ধরনের পরিবেশ বড় দ্রুত আপন হয়ে যেতো। এখন আর সক্রিয় থাকতে ভালোলাগেনা। মানসিক একাত্মতা আছে কিন্তু বাঁধন আলগা হয়ে গেছে। নিজের এই পরিবর্তনে ও আশ্চর্য হয়না। মনে হয় এটাই স্বাভাবিক, এটাই নিয়ম। কে যেন এসে কাঁধে হাত রাখে। জিজ্ঞেস করে,

কেমন আছিস? ও মাথা নাড়ে। ওর এই নির্লিপ্ত ব্যবহারে বন্ধু পাশ কাটিয়ে চলে যায়। আর কথা হয় না। যারা একসময় অন্তরঙ্গ ছিলো, তারা ঝরে যাচ্ছে। চর পড়ছে হৃদয়ে, বদলে যাচ্ছে নদীর বাঁক। হৃদয় এখন এক ভিন্ন পোতাশ্রয়ের সন্ধানে ব্যস্ত। অন্যমনস্ক মুনীর হাঁটতে হাঁটতে কোর্ট হাউস স্ট্রীটে আসে। নতুন রাষ্ট্রের আশা-উদ্দীপনা ম্লান হতে শুরু করেছে। ভাষাতো শুধু প্রকাশের মাধ্যম নয়। এতো অস্তিত্বের শেকড়। উপড়ে ফেললে শুকিয়ে যায় জাতিসত্তা। ওরা বড় বেশি কঠিন জায়গায় হাত দিয়েছে। মুনীরের অবিন্যস্ত, এলোমেলো চুলে দক্ষিণা হাওয়ার দাপট, বারবার উড়ে এসে কপালে পড়ে। কিন্তু চেতনায় সে হাওয়া আবহমান বাংলার ঝরাপাতা উড়িয়ে আনে। স্মরণ করায় বাঙালির উত্তরাধিকার। শোষকগোষ্ঠীর চক্রান্ত সে হাওয়ায় ধুলোর মতো উড়ে যায়। নিজে কি বুড়িয়ে যাচ্ছে? নইলে কেন ভাবছে বাংলার তরুণ সমাজকে এ চক্রান্ত রুখতে হবে। ওরা একা কেন? আমরাও আছি, আমাদেরও থাকতে হবে। বড় এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে চিন্তা, ব্যবধান বাড়ছে, ছিঁড়ে যাচ্ছে গিঁট। কারো সঙ্গে কথা বলে না। অন্যমনস্ক চুপচাপ বসে থাকে ও।

সেদিন বিকেলে জয়নুল আবেদিনের সঙ্গে পরিচয় হয়। তিনি তখন নর্মাল স্কুলের ড্রয়িং মাস্টার। পরিচয় পর্ব শেষ হতেই উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে মুনীর।

আপনার মন্বন্তরের ছবিগুলো এখনো আমার চোখের সামনে ভাসে। অসাধারণ কাজ। সেই ছবিগুলো না হলে বুঝি বাংলার মানুষের সত্যিকার চেহারা সবার চোখের সামনে উদ্ভাসিত হতো না।

জয়নুল আবেদিন মৃদু হাসে।

সেটা ছিলো পেটের দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, এখন মানুষের রুচির দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে চাই।

চমৎকার বলেছেন।

কলকাতার মতো ঢাকায়ও একটি আর্ট কলেজ হওয়া অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু এখানকার শিক্ষা বিভাগের কর্ণকুহরে তা প্রবেশ করাতে পারছিনা। বড় বড় অফিসাররা মনে করেন ছবি আঁকা একটা সৌখিন কাজ। ভেবে অবাক হবেন যে জনৈক কর্মকর্তা আমাকে বলেন, তাঁর ছাতায় নাম লিখে দিতে।

ঘরভর্তি লোক হো-হো করে হেসে উঠলে তিনি বলেন, আপনারা হাসছেন ? তখন রাগে-দুঃখে আমার কান্না পাচ্ছিলো।

মাথায় লম্বা, কালো চেহারায় বাংলার প্রকৃতির ছাপ, অনেকটা চষা ক্ষেতের রুক্ষ ঢেলার মতো, ভাঙতে কষ্ট হয়। চোখের দীপ্রতায় জয়নুল আবেদিন সবার মনোযোগ কেড়ে নেয়। মুনীরের মনে হয় তার উপস্থিতি ম্লান করে দিয়েছে আর সবাইকে। কোনো কোনো মানুষ বুঝি এমন হয়। যখন সে সেখানে থাকে তখন হীরের দ্যুতি ছড়িয়ে আলোকিত করে রাখে চারপাশ। তাকে ছাড়া আর কাউকে দেখা যায় না। এমন মানুষ কেন অসংখ্য হয় না ? তাহলে তো বদলে যায় দেশের সংস্কৃতি, স্বস্তি থাকে জাতির ধমনীতে। জয়নুল আবেদিনের স্পষ্ট, জোরালো বক্তব্য ভাষা আন্দোলনের একই তীব্রতায় সমান্তরাল।

আমিও ছাড়বোনা, ঢাকার বুকে আর্ট কলেজ হতেই হবে।

কণ্ঠ যেন ছড়িয়ে ছিটিয়ে গমগম করছে। যেন একজন নয় মিছিলের হাজার মানুষ একটি কণ্ঠে কথা বলছে। মানুষটির শিল্পকর্ম ওকে অভিভূত করেছিলো এখন মানুষটির মধ্যেও সে নাড়ির টান অনুভব করে। কোনো কোনো মানুষ থাকে যাদের দূর থেকে ভালোলাগে, কিন্তু কাছে এলে তেমন আকৃষ্ট করে না। জয়নুল আবেদিন তেমন নয়। দূরে এবং কাছে সমান। একইভাবে আকৃষ্ট করে। মুনীর জয়নুল আবেদিনের কথার রেশ ধরে গাঢ় কণ্ঠে বলে, ঠিকই বলছেন জয়নুল ভাই। রুচির দীনতা মানুষকে সাংস্কৃতিক দিক থেকে পিছিয়ে দেয়। আপনি আপনার কর্মসূচী অনুযায়ী এগিয়ে যান, আমরা আছি আপনার সঙ্গে, প্রয়োজনে ডাকবেন।

জীবনের সর্বক্ষেত্রে সুরুচির পরিচয় দিতে না পারলে জাতি হিসেবে আমাদের গর্ব করার কিইবা থাকবে !

জয়নুল আবেদিন চলে গেলে কথাগুলো মুনীরকে গভীরভাবে ভাবিত করে। মানুষ নিজের ঐতিহ্য, কলা-কৃষ্টি, সংস্কৃতি নিয়ে কত নিবিড়ভাবে ভাবে। এসব রক্ষার প্রয়োজনে যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে কুণ্ঠিত হয় না। ঢাকায় আর্ট কলেজ হবে, এ ব্যাপারে কত দৃঢ়প্রত্যয়ী জয়নুল আবেদিন, যেমন দৃঢ়প্রত্যয়ী ছিলো তার মন্বন্তরের ছবি। জীবনের সঙ্গে শিল্পের কত নিবিড় সখ্য ! এ না হলে বুঝি বড় শিল্পী হওয়া যায় না। শিল্পের জন্য যে ধৈর্য এবং ত্যাগের প্রয়োজন তা বুঝি সবার থাকে না। নইলে তার মধ্যে কেন এ দোলাচল বৃত্তি ? কেন নাড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে বিশ্বাসের ভিত ? জয়নুল আবেদিন যা করছে ও কি তা পারবে

না? তখন ও নিজেকে শাসায়। আত্মবিশ্বাসের অভাব হলে একজন মানুষের সরে যাওয়া উচিত। যে রাজনীতি ওর বিশ্বাসের প্রথম শর্ত ছিলো সেখান থেকে ও সরে যাচ্ছে। ধরে রাখতে পারছেনা নিজেকে। রণেশদা আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। আমার কি যেন হয়েছে। আমি আর আগের আমি নেই। নিজের ওপর এখন আর আমার কোনো শাসন নেই, কেবলই অনুরাগ বাড়ছে। ভিন্ন পথে বাঁক বদলের অনুরাগ। জলের রেখার মতো গড়িয়ে যাচ্ছি। মাথা জাম হয়ে যায় মুনীরের। অফিস থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ায়। একটুপর লিলির সঙ্গে দেখা হবে। লিলির বড় বোন নাদেরার বান্ধবী। নাদেরার সঙ্গে ও আসবে ওদের বাসায়। অস্থির হয়ে যায় হৃদয়। একটা রিক্সা ডেকে উঠে পড়ে। নওয়াবপুর রোডে রিক্সা আসতেই বারবার ইংরেজি বিভাগের অধ্যক্ষ এস. এন. রায়ের কথা মনে পড়ে, বড় বিক্ষিপ্ত মনে পড়া, কোনো কার্য-করণ নেই, তবুও। স্যার ওর প্রশংসা পত্রে লিখেছিলেন, **I have not taught many students with such a living interest in intellectual pursuits.** মন বিষণ্ণ হয়ে যায়। ফাল্গুনের বাতাসের সবটাই কেমন নষ্ট মনে হয়, যেন দখিনার প্রবল বিক্রম নেই। কি হয়েছে যেন, কোথাও ফাঁক হয়ে যাচ্ছে কি? কিছুই ভালোলাগেনা। মনে পড়ে ইয়াগোর বিখ্যাত উক্তি, **I am not what I am**, স্যার আপনি যা লিখেছিলেন তা বুঝি ধরে রাখতে পারছিনা। মাথা ঝাঁকিয়ে বারবার উচ্চারণ করে **I am not what I am.**

চমৎকার বিকেল কাটে লিলির সঙ্গে। খুব বেশি কথা হয় নি। কথায় কথায় হাসছিলো লিলি। বারবারই মুগ্ধতার সঙ্গে বলছিলো, আপনার কথা অনেক শুনেছি।

তাই। কারা বলে আমার কথা?

কৌতুকে চোখ নাচে মুনীরের।

অনেকে। কতজনের নাম বলবো?

আমি চাই না অনেকে আমার কথা বলুক। চাই শুধু একজনে বলুক।

লিলি লজ্জায় দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে নেয়। বুক কাঁপে ঢিপ ঢিপ করে। মুনীর দৃষ্টি ফেরায়না। নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকার সুখ অনুভব করে।

বলে, খুব কি বেশি চাওয়া হয়ে গেলো?

লিলি মিষ্টি হেসে খুব আস্তে করে বলে, বোধহয় না।

এখনো বোধহয় ?

মুনীরের কৌতুকে ও বিব্রত বোধ করে। তখন নাদেরা চা নিয়ে ঘরে ঢোকে। দু'জনের দিকে তাকিয়ে বলে, বুঝেছি ওকে একা পেয়ে জব্দ করা হচ্ছে ?

মোটেই না। তোমার বান্ধবীর বোন হলে কি হবে জব্দ করা কার সাধ্যি !

ইস ! ঢং কত।

মুনীর প্রাণখুলে হাসে। কতদিন পর আজ কি যে ভালোলাগছে।

দ্রুত ঘটনা ঘটতে থাকে। '৪৮-এর মার্চের ২ তারিখে ফজলুল হক হল মিলনায়তনে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ, তমুদ্দন মজলিস, প্রগতি সংঘ, গণতান্ত্রিক যুবলীগ, বিভিন্ন হলের ছাত্র নেতৃবৃন্দ এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের নিয়ে সভা হয়। নাজিমুদ্দিনের আচরণে সবাই বিক্ষুব্ধ, রাগী তরুণদের প্রতিবাদী কণ্ঠে ঘর গমগম করছে। তাজউদ্দিন বললো, ভাষা আন্দোলনকে একটা সার্বিক রূপ দেয়া প্রয়োজন এবং এই সংগ্রামকে সারা পূর্ব বাংলায় ছড়িয়ে দিতে হবে।

হ্যাঁ, তাই। যেমন বুনো ওল তেমন বাঘা তেঁতুল না হলে ওরা নতি স্বীকার করবেনা।

মোহাম্মদ তোয়াহা চেঁচিয়ে বলে।

যে কোনো ত্যাগের জন্যে আমাদের প্রস্তুত হতে হবে।

পেছন থেকে কে যেন নাটকীয় ভঙ্গিতে কথাটা বললে সবাই হেসে ওঠে। অনেকক্ষণপর ঘরের গুমোট কেটে যায়। রাগ এবং প্রতিবাদের ঝড় বইছিলো এতক্ষণ, এই হাসি বিশুদ্ধ বাতাস। ফুসফুস তেজি করে তোলে। তারুণ্যে নতুন জোয়ার আসে।

ঠিক হয়, যে 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' রয়েছে তার একটা ব্যাপকতর ভিত্তি গড়ে তুলতে হবে। আন্দোলনকে জোরদার করতে হলে চাই শক্ত মেরুদন্ড, যা মচকাবেনা, ভাঙবেনা। তাই ঠিক হয় প্রত্যেক হল, প্রতিষ্ঠান এবং দল থেকে দু'জন করে প্রতিনিধি নিয়ে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করতে হবে। কমিটির আহ্বায়ক মনোনীত হয় শামসুল আলম। সভায় বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য প্রস্তাব গৃহীত হয়। গণপরিষদের ভাষা থেকে বাংলাকে বাদ দেয়ার জন্যে

তীব্র নিন্দা করা হয়। সভায় ১১ মার্চ সমগ্র পূর্ব-বাংলায় সাধারণ ধর্মঘট ডাকা হয়।

১১ মার্চ অত্যন্ত সাফল্যজনক হরতাল পালিত হয়। নেতৃস্থানীয় কর্মীরা প্রত্যেকে পিকেটিং-এ অংশ নেয় এবং রেলওয়ে ওয়ার্কশপ ও ইডেন বিল্ডিং-এর গেটে পিকেটিং করে। ভাষা আন্দোলনকে বানচাল করার জন্যে সরকারের সঙ্গে উর্দু সমর্থকরাও যোগদান করে। পুলিশী হামলায় আহত হয় অনেকে, গ্রেফতার হয় বহু। শেখ মুজিবর রহমান, রণেশ দাশগুপ্ত, শামসুল হক, অলি আহাদ, শওকত আলী সহ আরো অনেকে। পুলিশী হামলার প্রতিবাদে ১৪ তারিখে আবার সর্বত্র ধর্মঘট পালিত হয়। রাতে সংগ্রাম কমিটির সভায় তাজউদ্দিন ১৫ তারিখে সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান জানিয়ে প্রস্তাব করে। কেননা ঐদিন পূর্ব-পাকিস্তান ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন বসবে। প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই দিনের হরতালের পিকেটিং-এ আবার পুলিশী হামলা এবং গ্রেফতার চলে। সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছিলো। কিন্তু কেউ দমবার পাত্র নয়। যেন সবকিছু উপেক্ষা করে সংগ্রামের লক্ষ্যে পৌঁছুবার দিন আজ। শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে প্রবল বাক-বিতণ্ডার পর নাজিমুদ্দিন সংগ্রাম পরিষদের আট-দফা দাবি মেনে নিয়ে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে। ঐদিন সন্ধ্যায় বন্দীদের মুক্তি দেয়া হয়।

বন্দীদের মুক্তি দিয়ে সরকার ভেবেছে সংগ্রাম পরিষদ আর কোনো আন্দোলনে যাবেনা। সে রকম ইঙ্গিতও দিয়েছে কিন্তু আমরা থেমে থাকতে পারবো না। চাপ অব্যাহত রাখার জন্য বিক্ষোভ করে যেতে হবে।

কথাগুলো বলে নঈমুদ্দিন সবার দিকে তাকায়।

ঠিক।

অন্যরা সায় দেয়।

ফজলুল হক হলের হাউস টিউটর ডঃ মযহারুল হকের রুমে বসে সংগ্রাম পরিষদের নেতা এবং কর্মীরা আলোচনা করে। এখানে তারা প্রায়ই মিলিত হয়। আজকের সভায় সভাপতিত্ব করছে নঈমুদ্দিন।

আগামীকালও বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে হবে।

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহতো ঢাকা আসছেন, তাঁর মনোভাব বাংলার পক্ষে নাও থাকতে পারে।

আশা করাই বাতুলতা।

নঈমুদ্দিন দৃঢ় কণ্ঠে বলে।

১৫ তারিখে বন্দীদের মুক্তি দিয়েছে। ১৬ ও ১৭ তারিখেও ধর্মঘট অব্যাহত থাকবে।

অবশ্যই। আমাদের বিক্ষোভ চলবেই চলবে।

আবার সেই নাটকীয় কণ্ঠ। সবাই হেসে ওঠে। ডঃ মযহারুল হকের ছোট ঘরে গুমোট। আয়তনের চাইতে লোকসংখ্যা বেশি। তার ওপর সিগারেটের ধোঁয়ায় সারা ঘর আচ্ছন্ন। কেউ কেউ কাশছে। দু'একজন উঠে বাইরে যায়। নঈমুদ্দিন কিছুটা উত্তেজিত। বিরূপ পরিস্থিতি ওকে সবসময় রুষ্ট করে রাখে। সভায় গোলমাল পছন্দ হয় না। সারা ঘরে মৃদু গুঞ্জন। যে যার মতো কথা বলছে।

সেই নাটকীয় কণ্ঠ উঁচু গলায় বলে, আজকের সভা একদম চৈতালী গরমে ঠাসা।

কি কথার ছিরি! চৈতালী গরম আবার কি?

বুঝলে না চোত মাসের গরম।

ঘরশুদ্ধ হাসির রোল জাগে।

সব সময় ঠাট্টা ভাল লাগে না।

নঈমুদ্দীন গম্ভীর হয়ে বলে। একটুপর প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে দেয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা আমাদের সঙ্গে যে সহযোগিতা করছেন তা না পেলে মুস্কিলই হতো।

কামরুদ্দিন বলে, একদম খাঁটি। স্যাররা যা করছেন, দারুণ।

করবেন না কেন? ভাষার প্রশ্নে প্রাণের টানতো সবার। এতো আর কারো একার পৈতৃক সম্পত্তি নয়।

তাজউদ্দিন বলে, এসব কথা থাক। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকায় এলে তাঁর সঙ্গে দেখা করে বাংলা ভাষার দাবি সম্বলিত একটি স্মারক-লিপি দিতে হবে।

হ্যাঁ, সেটার খসড়া তৈরি করে ফেলা দরকার।

ঢাকায় জিন্নাহর প্রোগ্রাম কি রে?

১৯ তারিখে আসবে। ২১ তারিখে রেসকোর্সে সংবর্ধনা, ২৪ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠান।

এর মাঝে একদিন আমাদের দাবি জানাতে হবে।

ওরা স্মারকলিপির খসড়া তৈরি করে। আগামীকাল কোথায় কোথায় পিকেটিং হবে সে সব ঠিকঠাক করতে করতে অনেক রাত হয়ে যায়।

একে একে অনেকে চলে যায়। থাকে চার পাঁচ জন। ওদের আলোচনা ফুরায়না, কাজ থামেনা। পরিকল্পনা যখন হয় তখন অল্প কয়েকজনে হয়। মিছিলে আসে অসংখ্যজন। যত রাত বাড়ে ওরা তত আত্মস্থ হয়, ওদের মাথা খোলাসা হয়। বাইরে ঝিঁঝিঁ ডাকে, বাগানের ঝোপে জোনাক জ্বলে। রাত বাড়ে, চাঁদ হেলে পড়ে। প্রকৃতি আপন নিয়মে চলে, ওদের মাথায় আগামীর পরিকল্পনা, ওদের মগজে স্বপ্ন, ওরা নতুন ভুবনের কারিগর। ওরা গড়ে, ভাঙে; ওরা নিয়মের শাসন মানে না।

২১ তারিখে রেসকোর্সের বিশাল সমাবেশে জিন্নাহ ঘোষণা করলেন, "উর্দু, একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।' সংগ্রাম পরিষদের কর্মীরা না, না ধ্বনিতে প্রতিবাদ করলো। কিন্তু তা হাওয়ায় মিলিয়ে গেলো। জনসমুদ্রের কোলাহলে তা কোনো জোরালো প্রতিবাদের ভাষা হয়ে উঠলোনা। ২৪ তারিখে কার্জন হলে তিনি যখন একই কথার পুনরাবৃত্তি করলেন তখন তার মুখের ওপর না, না ধ্বনি উচ্চারিত হলে ক্ষণকালের জন্য স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

কখনো এমন সময় আসে যখন সামান্য ক্ষুদ্র একটা ধ্বনি মুহূর্তের মধ্যে স্তব্ধ করে দিতে পারে সমুদ্রের গর্জন। স্তম্ভিত হয় সমগ্র জনপদ এবং ভৌগলিক সীমানা। মুনীরের মনে হয় ঐ 'না' ধ্বনি বিপুল বিক্রমে ছুটে আসছে জয়নুল আবেদিনের বিদ্রোহী ষাঁড়টির মতো। তার সামনের সব বাধা তুচ্ছ করে দিয়ে, তারুণ্যের অমিত তেজ এবং শক্তিতে। এভাবেই ভেঙে দেয় ফ্যাসিবাদের দেয়াল। ঐ 'না' ধ্বনি সোমেন চন্দের রক্ত, ঐ 'না' ধ্বনি সোমেন চন্দের জীবন। প্রবহমানতা এক থেকে বহুর জন্ম দেয়, মিছিলে যার মৃত্যু তার তো মৃত্যু নেই। সে তো ক্রমাগত চলছে, চলা তার ফুরোয়না। একজনের পরিবর্তে আর একজন এসে দাঁড়িয়ে যায় তার জায়গায়, পূরণ হয় শূন্যস্থানের। ঐ 'না' ধ্বনি পূর্ব-বাংলার কোটি কোটি মানুষের মিছিলের পুরোধা, সাফল্য এবং অগ্রগতির পথেই তার যাত্রা। যারা তা উচ্চারণ করে তারা জানে পরিণতি কি, তবু উচ্চারণ করে। এই ব্যতিক্রমটুকু আছে বলেইতো অন্যরকম হয়ে যায় রক্তের রঙ। যে রঙ রাজপথে ঝরে তা আর লাল থাকে না। মুছে যায় রঙ, বর্ণ, গন্ধ; তা হয়ে যায় এক অলৌকিক আলো। যে আলো নির্মাণ করে ইতিহাস, মুছে দেয় ভীরুতার গ্লানি। তেমন আলো

জ্বালিয়ে গেছে সোমেন চন্দ। মুনীরের কন্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। চশমা খুলে কাঁচ মোছে। বেশি আবেগে এমন হয়, চোখে পানি এসে যায়। একজন আবদুল হালিম চৌধুরীর কি শক্তি আছে যে মুনীরের পথ আটকে দাঁড়াবে? এমন হয় কেন? মাঝে মাঝেই বাবা এমন সামনে এসে দাঁড়ায়? থাক, তিনি তাঁর জায়গাতেই থাকুন। আমি আমার অবস্থানে। ভিক্টর হুগোর লা মিজারেবল পড়ছিলো, সেটা আবার খুলে বসে। ইদানিং পড়তে ভালোলাগে, ইচ্ছে করে সারাক্ষণই পড়তে।

কিছুদিন পর নাদেরাই খবরটা দিলো। ক্রোধে, ক্ষোভে উত্তেজিত। এমনিতেই বামপন্থী রাজনীতিতে প্রবল সক্রিয় নাদেরা, কোনো বাধা মানতে চায়না; নাজিমুদ্দিনের বিশ্বাসঘাতকতা ওকে ক্রোধান্বিত করেছে বেশি।

একজন মানুষ কি করে এত অল্প সময়ে তার ওয়াদার বরখেলাপ করতে পারে? সেইদিন সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে চুক্তি হলো—

এমনটিই হতো নাদেরা—

মুনীর ঠান্ডা মাথায় বলে।

কেন? কি বলছো?

তাঁর প্রভু মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ঐ বক্তৃতার পর তিনি কি আর বাংলার স্বপক্ষে কথা বলতে পারেন?

তা তো বটেই। সবতো পা-চাটা কুকুর।

নাদেরা চিবিয়ে চিবিয়ে উচ্চারণ করে। দাঁতের ঘর্ষণে কিড়মিড় করে শরীর।

চক্ষুলজ্জারওতো একটি সীমা আছে?

চোখের পর্দা থাকলেতো।

মুনীর হাসতে থাকে।

তোমার হাসি দেখে আমার গা জ্বলে যাচ্ছে। এত ঠান্ডা মাথায় থাকো কি করে?

বোস, ঠান্ডা হয়ে নে, আমাদের সামনে এখনো দীর্ঘপথ।

দেখো একই অধিবেশনে ভাষার ওপর বক্তৃতা দিতে গিয়ে মন্ত্রী হবীবুল্লাহ, বাহার আরবী হরফে নয়তো রোমান হরফে বাংলা লেখার পক্ষে ওকালতি করেছেন। এদের সামনে পেলে টুঁটি চেপে ধরতাম। সুবিধাবাদের রাজনীতি কি এমনি নির্লজ্জ?

হো-হো করে হেসে ওঠে মুনীর।

তোর উষ্মা দেখতে ভালোই লাগছে আমার। তবে আবেগকে এভাবে বের করে দেয়াই ভালো, নইলে শরীর খারাপ করবে।

তোমার ধৈর্য আমাকে বিস্মিত করছে। আমি আর কিছু বলতে চাইনা।

নাদেরা দুপদাপ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। অনেকক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে বসে থাকে মুনীর। মনে হয় অনেক দূরে একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলি ভীষণ কালো হয়ে আকাশের দিকে উঠছে। সামনে বড় দুঃসময়।

একটুপর নাদেরা আবার ফিরে আসে।

কি রে ছটফট করছিস কেন ?

কোথাও স্বস্তি পাচ্ছি না। মেজাজ খারাপ হলে মাথাটা কেমন গরম হয়ে যায়।

আয় আমার কাছে বোস।

চলো কোথাও থেকে ঘুরে আসি।

কোথায় যাবি ?

মন খারাপ তোর। তুই বল কোথায় গেলে ভালোলাগবে ?

নাদেরা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর হেসে ফেলে।

আমার মন খারাপ হলে কি হবে, যেখানে গেলে তোমার মন ভালো থাকবে চলো সেখানে যাই।

লিলির ওখানে ? আমি একমুহূর্তে রাজী। এমন সোনার সুযোগ কি ছাড়তে হয় ?

ইস একেবারে গদোগোদো। ঠিক আছে তৈরি হয়ে নাও।

নাদেরা যেতে যেতে বলে, তোমার মতো পাগল আমি দেখিনি।

রমনায় লিলিদের বাসা। দু'জনে রিক্সায় করে যখন আসে তখন মধ্য বিকেল। লিলি বারান্দায় বসে সেলাই করছিলো। ওদের দেখে এগিয়ে আসে।

কি ভাগ্য আমার।

এলাম আমাদের মন ভালো করতে।

নাদেরা কপট গম্ভীর্যে বলে।

মানে ?

লিলি কিছু না বুঝে অবাক হয়।

মানে আমাদের দু'জনের খুব মন খারাপ। ভাবলাম একমাত্র এখানে এলেই ভালো হবে। তাই চলে এলাম।

নাদেরা লিলির ঘাড়ে হাত রাখে। লিলি লজ্জায় মুনীরের দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি বলে, আসুন।

তাও ভালো যে আমার দিকে চোখ পড়েছে। ভেবেছিলাম—

কথা আর শেষ করে না। ওরা ঘরে ঢোকে। নাদেরা ঘরে ঢুকে বলে, ভাবাভাবির কিছুই নেই। ও তোমার দিকে সারাক্ষণই চোখ ফেলে রেখেছে। দুটো তো দিয়েছেই। শিবের মতো কপালে একটা থাকলে তাও দিতো। নিজের জন্য কিছুই রাখেনি।

হয়েছে, হয়েছে থাম এবার।

যাই দেখি খালাআম্মা কি করছেন।

নাদেরা চলে গেলে মুনীর লিলির মুখোমুখি হয়।

কেমন আছো ?

ভালো ?

শুধু ভালো ?

তাহলে খুব ভালো।

লিলি হেসে ওঠে। খুব সহজ ভঙ্গির এই হাসিতে ওকে খুব কাছের মানুষ মনে হয়। মুনীর মুগ্ধ চোখে তাকায়।

কেবলই মনে হয় সারাদিন তোমাকে দেখি।

বেশি দেখা ভালো না।

কেন ?

বেশি দেখলে নষ্ট হয়ে যায়।

আমার সেই ভয় নেই।

কেন আপনি কি—

আপনি নয় তুমি।

মুনীর ওকে থামিয়ে দেয়।

লিলি চোখ নিচু করে রাখে।

বলো ?

লিলি পরিপূর্ণ চোখে তাকায় এবং সহজভঙ্গিতে আস্তে করে বলে, তুমি।

এই বছরের শেষে মুনীর 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘে'র সম্পাদক নির্বাচিত হলো। সভাপতি অজিত গুহ।

এখন আমাদের প্রচুর কাজ করতে হবে মুনীর।

অজিত গুহ মুখোমুখি বসে কথা বলেন।

সামনে ভাষা আন্দোলন। সঠিক নেতৃত্ব না পেলে পুরো আন্দোলনই বানচাল হয়ে যাবে।

ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্ব ছাত্র সমাজের হাতে। ওরা ভুল করবে বলে আমি বিশ্বাস করি না। তবে আমাদেরও প্রবলভাবে সক্রিয় থাকতে হবে।

আমিও তোমার সঙ্গে একমত।

আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে তিনি চলে গেলেও মুনীর অনেকক্ষণ বসে থাকে। কিছুদিন আগে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট পার্টির সম্মেলনে যোগদান করতে গিয়েছিল। সে স্মৃতি বুকে বড় উজ্জ্বল। দলের সার্বক্ষণিক নেতৃস্থানীয় কর্মী হয়ে কাজ করছে। তবুও মাঝে মাঝে সুর কেমন কেটে যায়, মনে হয় অন্যকিছু চাই, অন্য ভুবন কিংবা নিরিবিলি গৃহকোণ। জুন মাসের ৩০ তারিখে করোনেশন পার্কের সভায় সভাপতিত্ব করার পর থেকেই এমন মনে হচ্ছে। সভায় বক্তা ছিলো সরদার ফজলুল করিম আর রণেশ দাসগুপ্ত। সেদিন কি উদ্বেগ উত্তেজনায় কেটেছিলো দু'জনের। ওরা মাঝে মাঝে সে গল্প করে। দু'জনেই আশংকায় ছিলো মুনীর যদি শেষ পর্যন্ত না আসে। মুনীরের হাসি পায়। শেষ পর্যন্ত ও ঠিক সময়েই পেৌঁছেছিল। কথা দিলে ও কথা রাখে। কখনো কর্তব্য জীবনের চাইতে বড় হয়ে যায়। তখন ওর সামনে সব বাধা তুচ্ছ হয়, ও প্রবল পরাক্রমে ডিঙিয়ে আসে সব। কিন্তু সেদিন সভা শেষ করতে পারেনি। সেও এক নিদারুণ অভিজ্ঞতা। মুসলিম লীগের লোকেরা সভা ভেঙে দেয়। পরে কমিউনিস্ট পার্টির অফিস আক্রমন করলে মুনীরের হাতে আঘাত লাগে। স্বাধীনতার পর থেকেই ওদের ওপর হামলা বেড়েছে, নির্যাতনের মাত্রা চরমে উঠেছে। নেতারা অনেকেই আত্মগোপন অবস্থায় আছে। ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক সমিতি প্রভৃতি শ্রেণী সংগঠনগুলো ধ্বংস করার জন্য সরকার বিভিন্ন পন্থায় আক্রমণ চালাচ্ছে। খবর পেয়েছে তেভাগা আন্দোলনে নেতৃত্বের অপরাধে কম্পরাম সিং জেলে।

তাকে রাজবন্দী হিসেবে রাজশাহী সেণ্ট্রাল জেলে পাঠানো হয়েছে। মাঝে মাঝে কেমন হতাশ হয়ে যায়। এই বিরুদ্ধ পরিবেশে দম আটকে আসে। রণেশ এগিয়ে আসে।

কিছু ভাবছো মনে হয় ?

আপনি কেমন আছেন রণেশদা ?

আমি ভালো। তোমার হাতের ব্যথা কমেছে ?

হ্যাঁ, এখন অনেক কম।

সত্যেন সেনকে গ্রেফতার করেছে।

কবে ?

এইতো তিনদিন আগে। খবর পেলাম আজ।

মুনীর চুপ করে থাকে। সত্যেন সেনের কৃষক আন্দোলনের অভিজ্ঞতা শুনতে ভীষণ ভালোলাগে, বলেও চমৎকার করে। কিন্তু লেখেনা, সত্যেন সেনের এসব লেখা উচিত। শুধু গণ-সঙ্গীত রচনা করে ক্ষান্ত হলেই হবে না। সত্যেন সেনের জীবনে আছে উপন্যাসের বিস্তৃতি, তাঁর উপন্যাস লেখা উচিত। আত্মত্যাগী এই মানুষটি অসাধারণ।

রণেশদা, সত্যেনদার সঙ্গে দেখা হলে উপন্যাস লিখতে বলবেন।

হঠাৎ একথা বলছো কেন ?

তাঁর জীবনতো উপন্যাসের মতো। আমার মনে হয় এত অভিজ্ঞতা নিয়ে না লেখা অপরাধ। তাছাড়া জেলে প্রচুর সময় পাবেন। কাজের মধ্যে সময় কাটবে ভালো।

হ্যাঁ, ওর জীবনের অনেক সময় জেলে জেলেই কাটলো।

মুনীরের মনে হয় তবু এরা ভেঙে পড়েনা। এরা একদম অন্য ধাতুতে গড়া। কোথা থেকে আসে এমন অবিরাম জীবনীশক্তি ?

জানো মুনীর, রাজশাহীর নাচোল আর নওয়াবগঞ্জ থানার কৃষকদের মধ্যে তেভাগা আন্দোলন শুরু হয়েছে। সাঁওতাল সর্দার মাতলার নেতৃত্বে আন্দোলন দানা বেধে উঠেছে। সাঁওতালদের মধ্যে মাতলাই প্রথম কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য। ওদের সঙ্গে জমিদার রমেশ মিত্র আর ইলা মিত্রও কাজ করছে। ইলা মিত্রতো দারুণ জনপ্রিয়। সাঁওতালরা তাঁকে রাণীমা ডাকে।

শুনতে শুনতে মুনীর আচ্ছন্ন হয়ে যায়। স্বামী-স্ত্রী ঘর ভেঙে আন্দোলন করছে, আর ওর চোখে এখন নীড়ের স্বপ্ন। কেবলই মনে হয় স্থায়ী উপার্জন এবং নীড় চাই। এখন বুঝি কিছুটা স্থিত হবার সময় এসেছে। মনচাইছে কিছুটা আড়াল, কিছুটা নিভৃত আশ্রয়।

তোমাকে আজ একটু অন্যমনস্ক মনে হচ্ছে মুনীর ?

এমনিতে। তেমন কিছু হয় নি। ভাষা আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত হয়ে গেলো।

হ্যাঁ, আমার মনে হয় জনসাধারণ পূর্ণ সমর্থনে এগিয়ে আসে নি তাই।

ডিসেম্বরের শেষেতো পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন হবে ? অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি মন্ত্রী হবীবুল্লাহ্ বাহার।

ভালোই হবে। কাঁটা দিয়ে কাঁটা উঠানো যাবে।

আমিও তাই ভাবছি রণেশদা। কথা বলার একটা প্লাটফরম পাওয়া যাবে। ঘরে ফিরবেন না ?

চলো যাই।

দু'জনে রাস্তায় বেরুতেই কোর্টের সামনে জয়নুল আবেদিনের সঙ্গে দেখা। মুনীর খুশি হয়ে ওঠে।

কেমন আছেন জয়নুল ভাই ?

ভালো। খুশির খবর আছে।

তাই নাকি, বলুন ?

আমি সাকসেসফুল হয়েছি। ঢাকায় আর্ট কলেজ হচ্ছে। সব ঠিকঠাক।

নাম কি হলো ?

পূর্ব পাকিস্তান সরকারী আর্ট ইনস্টিটিউট।

যাক, খুব ভালো।

আপাতত জনসন রোডের ন্যাশনাল মেডিক্যাল স্কুলের একতলার দু'টো ঘর ভাড়া করে কাজ শুরু হবে। যাই দেখা হবে।

জয়নুল আবেদিন এক ঝলক বাতাসের মতো চলে গেলেন। তিনি কোন এক গোলাপ বাগান থেকে সুগন্ধী বয়ে এনে ছড়িয়ে গেলেন।

যে জাতির এত কৃতি সন্তান থাকে সে জাতি পিছিয়ে থাকে না মুনীর।

উঃ রণেশদা আপনি মাঝে মাঝে এমন গভীর করে কথা বলেন যে, বুকটা হিম হয়ে যায়।

দু'জনে রিক্সায় ওঠে, দু'জনেই নীরব। রাস্তায় চলার গতি, সাঁই সাঁই ছুটছে মানুষ, যানবাহন। দু'জনের বুকের ভেতর ধ্বনি-প্রতিধ্বনি, শুধু শাব্দিক ব্যঞ্জনায় মুখর নয়।

কার্জন হলে পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মূল সভাপতি ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। সম্মেলনে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্র-ভাষা করার প্রস্তাব সর্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়। ড. শহীদুল্লাহ আরবী কিংবা রোমান হরফে বাংলা লেখার ষড়যন্ত্রের তীব্র বিরোধিতা করে বক্তৃতা করেন। এক পর্যায়ে বলেন, 'আমরা হিন্দু বা মুসলমান তা যেমন সত্য, তার চেয়েও সত্য আমরা বাঙালি। এটি কোনো আদর্শের কথা নয়। এটি বাস্তব সত্য।' বক্তৃতা শুনতে শুনতে মুনীর আবেগে

বিহ্বল হয়। মুসলিম লীগের এমন দোর্দণ্ড শাসনের সময়ে এমন জোরালো বক্তব্য সত্যি অভাবনীয়। সভা শেষে একা একা রাস্তায় হাঁটে অনেকক্ষণ, কিছুই ভালো লাগে না। কোথায় যেন সুর কেটে গেছে, তাই চিত্ত বিক্ষিপ্ত। ঘুরে ফিরে বক্তৃতার কথা মনে হয়। ভেসে ওঠে লিলির মুখ। জীবনের জন্যে দু'টোই সমান প্রয়োজন। নিজস্ব ভুবনতো ভাষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি এবং প্রেমের। গড়তে চাই আপন আগার। কবে কখন? নিজেকে প্রশ্ন করে ও। লিলি এখন খুব কাছের। যেন নড়লেই বুকের মধ্যে শব্দ ওঠে। যত শিগ্‌গির সম্ভব একটা কিছু করে ফেলতে হবে। বুক কেঁপে ওঠে। জীবনের একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। লিলি বলেছিলো, বড় অস্থির সময় কাটে। কিছুই ভালোলাগেনা। মুনীরের মনে হয়েছিলো এই একই কথাতো ওর নিজেরও। সময়ই কাটতে চায়না। উন্মুখ প্রত্যাশা কেবলই খুঁজে বেড়ায় একজনকে। ওর প্রেমের কথা আবদুল হালিম চৌধুরীর কানে গেছে। তিনি কঠোর ভাষায় আপত্তি করেছেন। বলেছেন, তিনি বেঁচে থাকতে এসব হবেনা। কেন হবেনা? ফুঁসে ওঠে হৃদয়। মুনীর নিজেকে সামলে নেয়। ওতো জানে হবেই তবে আর উত্তেজনা কিসের? মাথা ঠান্ডা রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ। ও ভিন্ন কিছু ভাবে। আগামী-কাল অজিত গুহ বক্তৃতা করবেন, মন খুলে কথা বলবেন তিনি। তাঁর জীবনে পিছু টান নেই, বন্ধন তাঁকে ধরে রাখে না। তিনি মুনীরের প্রিয় মানুষের একজন। এলোমেলো বিক্ষিপ্ত ভ্রমণ উদাসীন করে ফেলে ওকে। রণেশকে বলা হয়নি যে খুলনার দৌলতপুরে ব্রজলাল কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপকরূপে নিযুক্তি পাওয়ার কথা হচ্ছে। হয়ে গেলে চলে যাবে।

৯

১৯৪৯-এ আবার আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠলো। বিভিন্ন দাবি দাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্ন বেতনভূক কর্মচারীরা ধর্মঘট পালন করে। ছাত্রসমাজ এ ধর্মঘটে সমর্থন দেয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্ট কালের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিয়ে ছাত্রদের হল ত্যাগের নির্দেশ দেয়। ২৭ জন ছাত্রছাত্রীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক

ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এই ধর্মঘটে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে নাদেরা বেগম। তাকে শুধু জরিমানা করেই ক্ষান্ত হয়নি কর্তৃপক্ষ। কিছুদিন পর গ্রেফতারও করে। মুনীর দেখা করতে গেলে হেসে বলে, আমার জন্যে তোমরা ভেবো না আমি ভালো আছি।

সে আমি জানি, আমার মজা লাগছে এই ভেবে যে তোর নামটা লোকের মুখে মুখে বেশ উচ্চারিত হচ্ছে।

তাই ?

হ্যাঁ রে অনেকটা চিত্রতারকার মতো জনপ্রিয়তা আর কি ?

ঠাট্টা কোরোনা কিন্তু।

দু'জনে হেসে ওঠে।

বামপন্থী রাজনীতিতে মেয়েরা এমন সক্রিয় থাকতে পারে এটা সবার কাছে একটা বিস্ময়।

রাখো এইসব কথা। তুমি দৌলতপুর যাচ্ছ কবে ?

আগামী শনিবার !

এত তাড়াতাড়ি ?

মন খারাপ হয়ে গেলো ?

নাদেরা চুপ করে থাকে। এই ভাইটি কাছে না থাকলে মনের জোর অনেক কমে যায়।

কি রে চুপ করে গেলি যে ?

তোমার যাবার সময় হলো।

আর কথা বলবি না ?

না।

নাদেরা মাথা ঝাঁকিয়ে বলে।

ফিরে এসে দেখবো ছাড়া পেয়ে গেছিস।

সেটা নাদেরার কাছে কোনো সান্ত্বনার কথা হয়না। মুনীর ঢাকা থেকে দূরে চলে যাচ্ছে এই কষ্টই এখন প্রধান।

নিম্ন বেতনভুক কর্মচারীদের আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ছাত্রদের এই বহিষ্কার এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তুমুল হয়ে ওঠে। ধর্মঘট শুধু ছাত্রদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। বিশেষ করে এপ্রিলের ২৫ তারিখে ধর্মঘটে যোগদান করে সরকারী কর্মচারী এবং সাধারণ মানুষ। দুপুরের পর আরমানীটোলা মাঠ লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। তিল ধারণের ঠাঁই নেই। সভাপতি তাজউদ্দিন সভায় দাঁড়িয়ে। পুরো ব্যাপারটা মুনীরের কাছে অভূতপূর্ব মনে হয়। আটচল্লিশের

ভাষা আন্দোলনে জনসাধারণের যোগাযোগ ছিলোনা বলে স্তিমিত হয়ে গিয়েছিলো। এখন আন্দোলনে নতুন জোয়ার আসছে। মুনীর আশাবাদী হয়ে ওঠে। সভা শেষে মিছিল যখন সেক্রেটারিয়েটের দিকে এগিয়ে যায় মুনীরের মনে হয় প্রাণ ফিরে আসছে আন্দোলনে।

—লিলিকে বিয়ে করার ব্যাপারে আবদুল হালিম চৌধুরীর অনমনীয় মনোভাব এখন আর ওকে মানসিক দিক থেকে পীড়িত করে না। গা-সওয়া হয়ে গেছে। নাদেরা প্রসঙ্গ তুললে খেপে যায়।

বাবা কি জানে না বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো? মনে রাখিস আমি ভয় পাইনা। যাকে পছন্দ করেছি তাকেই বিয়ে করবো।

নাদেরা ঠাট্টার সুরে ঠোঁট উল্টে বলে, শুধু পছন্দ ভালোবাসা না?

দ্যাখ মেজাজ খারাপ। খেপাস না কিন্তু।

রাগছ কেনো?

বাবার সঙ্গে বিরোধ করেই তো এগুতে হলো নাদেরা।

জানি। মন খারাপ করো না।

পাগল, অন্য বিষয়ে মন খারাপ করার সময় কি আছে?

এখন তো বিষয় একটাই না?

মারবো একটা—

দু'জনে হাসতে হাসতে মনের মেঘ উড়িয়ে দেয়। মুনীরের মনে হয় ধুমল আকাশে এখনো অনেক রোদ।

পরদিনই শিক্ষকতার জন্যে চলে যায় দৌলতপুর কলেজে। সম্পূর্ণ ভিন্ন পেশায় ভিন্ন জগতে, এতদিনের চিরচেনা পরিবেশ পেছনে রেখে।

বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে চক্রান্ত আবার নতুন করে ধুমায়িত হয়। কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী ফজলুর রহমান আরবী হরফে বাংলা লেখার ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠেন। পেশোয়ারে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের সভায় তিনি আরবী হরফে বাংলা লেখার স্বপক্ষে যুক্তি দেখিয়ে বক্তৃতা করেন। এই হীন প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। শুরু হয় ধর্মঘট, মিছিল, ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ইত্যাদি নানারকম কর্মকাণ্ড। প্রতিবাদে, বিক্ষোভে ক্ষুব্ধ নগরী। কলেজের কাজে ঢাকায় এলো মুনীর। ঢাকায় আসার কয়েকদিনের মধ্যেই রাজনৈতিক তৎপরতার অভিযোগে গ্রেফতার হলো।

জেলখানাতেই একদিন রণেশের সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ হলো। রণেশ বললো, আমাদের সংগ্রাম শুরু হয়েছে। মুসলিম লীগের নির্যাতন, দমননীতি চরমে উঠেছে। এখন আমাদের পিছু হটলে চলবেনা।

মুনীর চুপ করে থাকে। রণেশ উত্তেজনায় অস্থির।

মুনীর এখন আর সাহিত্য নয়, অধ্যাপনা নয়, প্রয়োজন শুধু রাজনৈতিক সংগ্রাম।

আমার অধ্যাপনা ভালোলাগে। শিক্ষকতাকেই পেশা হিসেবে নেবো ভেবেছি। শিক্ষার সনাতনী প্রথা ভেঙে আমাদের নতুন কিছু করা দরকার। যে শিক্ষা পাঠ্য পুস্তকের তথাকথিত জ্ঞান ছাড়া আর কিছুই শেখায় না, সেই শিক্ষাকে আমি করুণা করি রণেশদা।

তুমি প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে দূরে সরে যাচ্ছো ?

মুনীর একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, হ্যাঁ।

রণেশের কণ্ঠ খাদে নেমে যায়।

আমি জানি আমাদের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তুমি সবচেয়ে প্রতিভাবান বক্তা। তুমি যখন ঈর্ষণীয় নাটকীয়তায়, বিষয়বস্তুর সঙ্গে আন্তরিক একাত্মতায় এবং অসাধারণ বাচনভঙ্গিতে বক্তৃতা দাও শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে শোনে।

আমাকে লজ্জা দিচ্ছেন রণেশদা ?

না, বাস্তব সত্য কথা বলছি। তবু আমরা তোমার কাছে আরো কিছু চাই মুনীর।

প্রত্যক্ষ রাজনীতি আর নয়, বরং এ দেশের সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক, নৃতাত্ত্বিক পরিচয়কে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরার দায়িত্ব আমার। সেজন্যেই সভা সমিতিতে বক্তৃতা করাকে আমি সামাজিক দায়িত্ব বলে মনে করি।

রণেশের খুব কষ্ট হয়। বুঝতে পারে মুনীর চৌধুরী সরে যাচ্ছে, দূরে চলে যাচ্ছে।

রণেশদা আমরাতো এখনো স্রোতের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করছি, মনে পড়ে কি সেদিনের কথা ?

পড়ে।

রণেশ ঘাড় নাড়ে।

আটচল্লিশের মে মাসে যখন কমরেডরা আত্মগোপন করেছে, তখন বাইরে পার্টি অফিস চালাচ্ছিলো রণেশরা কয়েকজন। নারায়ণগঞ্জ থেকে অদূরে শীতলক্ষ্যার অপর পারে একটি গ্রামে দু'দিন আলোচনায় বসে-

ছিলো সবাই। তখন মুনীর ছিলো সবার মধ্যে উজ্জ্বল প্রাণবন্ত সঙ্গী। বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যেও সবাইকে চাঙ্গা রাখার জন্য হাসি-ঠাট্টা রসিকতায় মাতিয়ে রাখতো আসর। নৌকায় পার হবার সময় নদীতে ভীষণ ঢেউ ছিলো।

রণেশ অনুচ্চ কণ্ঠে বলেছিলো, নদীও আমাদের প্রতি বিরূপ।

মোটেই না।

মুনীর প্রবল আপত্তি করেছিলো।

নদী আমাদের শিক্ষা দিচ্ছে। বিরূপ পরিবেশের মধ্য দিয়ে কিভাবে এগোতে হয়, এটা তার প্রাথমিক পাঠ।

ওর কথায় সবাই হেসেছিলো।

রণেশকে চুপ করে থাকতে দেখে মুনীর বলে, রণেশদা দুঃখ পেলেন ?

না। ভাবছি তোমাকে পার্টিতে ধরে রাখা অনাবশ্যক।

ভাষাকে কেন্দ্র করে বাঙ্গালির জাগরণের সময় এখন। মানুষ আত্ম-আবিষ্কারে উন্মুখ। ওদের পিপাসা মেটাতে হবে। স্বদেশ, স্বজাতির কৃষ্টি-সংস্কৃতির পরিচয় তুলে ধরা আমাদের কর্তব্য। তাই বক্তৃতাই সহজ মাধ্যম।

আমি তোমার সঙ্গে একমত। সোমেন চন্দের সঙ্গে তোমার একটা আশ্চর্য মিল আছে। সোমেন প্রচুর পড়তো। তুমিও পড়ো। দাঙ্গার পটভূমিতে ও লিখেছিলো গল্প 'দাংগা', তুমি লিখেছ নাটক 'মানুষ'। দু'জনেই কম্যুনিস্ট।

একটি জায়গায় অমিল আছে রণেশদা।

কি ?

সোমেন মধ্যবিত্তের বেড়ি অতিক্রম করে সর্বহারা হতে পেরেছিলো, আমি জীবনের মোহের কাছে পরাজিত হয়েছি।

না ভুল। ঠিক বলো নি।

মুনীর একটু চেঁচিয়ে বলে, রণেশদা, I am not, what I am.

এ তোমার যন্ত্রণার কথা।

আমি ঠিক করেছি, জেল কর্তৃপক্ষের কাছে রাজনীতি করবো না, স্বীকারোক্তি দিয়ে জেল থেকে বেরিয়ে যাবো।

ঘরে অখন্ড নীরবতা। সামনে লোহার গরাদ। সেই গরাদের ফাঁকে সামনের চত্বরে নিমগাছের পাতা দেখা যায়, সবুজ, ছোট এবং দৃষ্টি স্নিগ্ধ করা।

সাথী হারানোর বেদনা রণেশকে আপ্লুত করে রাখে। গলার কাছে চাক-বাঁধা কান্নার দলা। মুনীর কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বলে, এই রাজনীতির প্রতি আমার অশ্রদ্ধা নেই। তবে এর দীর্ঘসূত্রিতা আমার দ্বারা সম্ভব না। সম্পূর্ণরূপে জীবনকে বিলিয়ে দিতে পারলে আমি ধন্য হতাম, কিন্তু সে ত্যাগের ক্ষমতার অভাব আছে আমার মধ্যে। তাই রাজনীতি ছেড়ে দেবো একেবারে।

মুনীরের স্বীকারোক্তির পর রণেশ কিছু বলেনা। কেউ যদি জেনে-শুনে ছেড়ে দেয় তাকে কিছু বলার নেই। অসম্ভব কষ্ট কাটিয়ে উঠতে সময় লাগে রণেশের।

উনপঞ্চাশের সেপ্টেম্বরের তিরিশ তারিখে লিলির সঙ্গে বিয়ে হয়ে যায় মুনীরের। লিলিদের রমনার বাসায়, ঘরোয়া পরিবেশে, চা-মিষ্টির আপ্যায়নে বিয়ে।

রাতে বাসরে ও লিলিকে বলেছিলো, তুমি খুশি হয়েছো ?

হ্যাঁ।

এমন বিয়েই আমি চাই লিলি যেখানে আনুষ্ঠানিকতার চাইতে প্রাণের টান প্রবল হয়।

আমিও।

লিলি মাথা নেড়েছিলো। ও তখন বি. এ. পড়ছে। বয়সে তরুণ। কিন্তু মুনীরকে বুঝতে পেরেছিলো ঠিকই।

মফস্বলে বসে নিজের ছোট গৃহকোণকে প্রতিদিনের খবর দিয়ে ভরিয়ে রাখে মুনীর। নিরিবিলি সংসার, ভালোই সময় কাটে। রাজ-নীতির মতো লিলি মীর্জার সঙ্গে বিয়েটাও আবদুল হালিম চৌধুরী অনুমোদন করেন নি। তাতে আক্ষেপ নেই। আসলে চলার পথের চড়াই উৎরাইয়ে কতকিছুইতো ঝরে পড়ে, কত কিছু যোগ হয়। সংযো-জন এবং বিয়োজনের নামই জীবন। মুনীর চৌধুরী সান্ত্বনার জায়গা খুঁজে নিয়েছে। প্রেম এবং পড়াশোনা এখন তার জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ। তবু হৃদয়বৃত্তির পাতলা আবরণের অন্তরালে ফল্গু-ধারার মতো বয় রাজনীতির বহমান স্রোত। একদিন ডাকযোগে ইলা মিত্রের ওপর মুসলিম লীগ সরকার যে পাশবিক অত্যাচার করেছে সে সম্পর্কিত লিফলেট পায়। পাঠিয়েছে গাজীউল হক। পড়ে বিমূঢ় হয়ে থাকে অনেকক্ষণ। লিলি এসে মুখ দেখেই আঁচ করে, কি হয়েছে ? খারাপ খবর কি ?

পড়ে দেখো।

প্রচারপত্রটি লিলিকে দিয়ে নিজে বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। নাচোলের কৃষক আন্দোলন দমন করার জন্যে সশস্ত্র সৈন্য পাঠানো হয়েছিলো। এর আগে কয়েক জন পুলিশকে কৃষকরা বল্লম, তীর-ধনুক দিয়ে হত্যা করেছে। এখানকার অবস্থা, আন্দোলনের ব্যাপকতা সম্পর্কে সরকারের স্পষ্ট ধারণা ছিলোনা। তাই মাত্র পাঁচজন পুলিশ ও একজন দারোগা পাঠানো হয়েছিলো। তাদের কাছে ছিলো রাইফেল। পুলিশের আগমনে বিক্ষুব্ধ কৃষকরা তাদের ঘিরে ফেলে। পুলিশও বেপরোয়া গুলি ছোঁড়ে। কিন্তু ফল হয় উল্টো। ক্রুদ্ধ কৃষকদের হাতে সবাই নিহত হয়। এই খবরে সরকার ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। হাজার দু'য়েক সৈন্য আমনুরা রেল স্টেশনে নামে। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়, যাকে পায় তাকে হত্যা করে। স্টেশন থেকে নাচোল আট মাইল। হিংস্র সৈনিকদের হাত থেকে বাঁচার জন্যে যে যেদিকে পারলো পালালো। চারশত লোক নিয়ে সীমান্ত পার হতে যাচ্ছিলেন ইলা মিত্র। কিন্তু পথ দেখাবার উপযুক্ত লোক ছিলো না। রোহনপুর স্টেশনের কাছে ছিলো সৈনিকদের ক্যাম্প। ভুলক্রমে সেই পথে এসে পড়তেই সৈনিকরা তাদের ঘিরে ফেলে। শুধু বর্শা, বল্লম দিয়েতো আধুনিক রাইফেল, মেশিনগানের মোকাবিলা করা যায় না। ফলে ৭ তারিখে রোহনপুর স্টেশনে ধরা পড়ে ইলা মিত্র।

পড়া হলে লিলিও বারান্দায় আসে।

মানুষ এমন অমানুষ হতে পারে? ভাবলে আমার গা শিউরে ওঠে।

আমারও গা শিউরে ওঠে লিলি। ইলা মিত্রের ওপর যে পৈশাচিক এবং বীভৎস অত্যাচার করা হয়েছে, তা একমাত্র নাৎসী ফ্যাসিস্টদের অত্যাচারের সঙ্গে তুলনীয়।

সে রাতে ঘুম আসে না মুনীরের। পায়চারি করে, পানি খায়। অস্থিরতা কিছুতেই তাড়াতে পারেনা। সিগারেটে স্বস্তি আসেনা। দরজা হাট করে খুলে দেয়। হু হু বাতাস বুকে টেনেও বুঝতে পারে এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ ঘনিয়ে উঠছে। কোনো দিক ফাঁকা নেই, চারদিকেই বেড়ি।

জানুয়ারি থেকে এপ্রিল, মাত্র ক'টা মাস। ইলা মিত্রের ঘটনা মানুষের হৃদয়ে দগদগে ক্ষতের মতো থাকতে থাকতেই রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলের খাপরা ওয়ার্ডে গুলির খবর দাউদাউ করে জ্বলে উঠলো। দমন-নীতির আর এক তাণ্ডব রূপ। ২৪ এপ্রিল তারিখে সাতজন রাজবন্দীর সঙ্গে শহীদ হলেন কম্পরাম সিং, মুনীরের প্রিয় কৃষক-নেতা। যার

সম্পর্কে গল্প শুনতে ভালোবাসতো, যাঁর সঙ্গে কোনো দিন পরিচয় হয়নি অথচ যিনি ছিলেন রূপকথার নায়কের মতো। যাঁকে মুনীর কল্পনার হাজারো অবয়বে গড়েছিলো। রাজবন্দীদের উপর অমানুষিক দুর্ব্যবহার এবং অপমানের প্রতিবাদে মুখর হয়েছিলেন তাঁরা। বৃটিশ আমল থেকে রাজবন্দী হিসেবে তাঁরা যে সব সুযোগ সুবিধা এবং অধিকার ভোগ করছিলেন মুসলিম লীগ সরকার তা নাকচ করে দিলে শুরু হয় বিরোধ। রাজবন্দী ও সাধারণ কয়েদীরা একসঙ্গে অনশন ধর্মঘট শুরু করে। জেল সুপারিনটেনডেন্ট অনশন প্রত্যাহারের অনুরোধ জানান। কিন্তু রাজবন্দীরা দাবি মানা না হলে অনশন প্রত্যাহার করা হবে না বলে তাদের সংকল্পের কথা ঘোষণা করেন। আই. জি. আমির হোসেন সুপারিনটেনডেন্টকে নির্দেশ দেন যেন পনেরো ষোল জনকে আলাদা করে চৌদ্দ নম্বর—অর্থাৎ মৃত্যু দাণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্তদের সেলে—নিয়ে যাওয়া হয়। এই সময় কারাগারে মানুষ দিয়ে তেলের ঘানি টানানো হতো। অনশনকারীরা এই প্রথা বাতিলের এবং সাজাপ্রাপ্ত কয়েদীদের সরকারী খরচে বিড়ি সরবরাহ করার দাবী জানাচ্ছিলো। ১৪ এপ্রিল আই. জি. রাজবন্দী ও সাধারণ কয়েদীদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন। সিদ্ধান্ত হয় দাবি মেনে নেয়া হবে। অর্থাৎ মানুষ দিয়ে আর তেলের ঘানি টানানো হবে না। সরকারী খরচায় বিড়ি দেয়া সম্ভব না, তবে যারা নিজের পয়সায় তামাক বা বিড়ি খেতে চায় তা তারা খেতে পারবে। এখন থেকে মারপিটও বন্ধ হবে। এইসব সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে অনশন ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হয়।

১৪ তারিখের দশ দিন পরই সেই নারকীয় দিন এগিয়ে আসে। ২৪ এপ্রিল সকাল ন'টায় জেল সুপার মিঃ বিল তাঁর সাপ্তাহিক পরিদর্শনে আসেন। সুপার খাপরা ওয়ার্ডের বারান্দায় দাঁড়িয়ে রাজবন্দীদের সাথে আলাপ শুরু করেন।

হানিফ শেখ প্রথমেই আপত্তি তোলে।

আমরা দুই বেলা কুমড়োর ঘ্যাঁট আর খেতে পারবোনা সাহেব। আমাদের খাবারের তালিকা বদলাতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে বিলও উগ্র হয়ে ওঠে।

তোমরা ক্রিমিনাল। তোমাদের যা দেয়া হচ্ছে তাই যথেষ্ট। আর বেশি কিছু দেয়া সম্ভব না।

আমরা ক্রিমিনাল ? তার আর কি দেখলে ?

আনোয়ারের কণ্ঠে শ্লেষ।

বেশি বাড়াবাড়ি করোনা। তোমাদের কনডেমন্ড সেলে পাঠানো হচ্ছে।

না, আমরা ওখানে যাবো না।

সবাই আপত্তি জানায়। শুরু হয় কথা কাটাকাটি। বিল হাতের ছড়ি তুলে একজনকে মারতে গেলে সুধীন ধর বিলের ছড়িসহ হাত ধরে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়। ধস্তাধস্তি করে বিল অল্পক্ষণের মধ্যে বেরিয়ে আসে। বাইরে থেকে ঘর বন্ধ করে দেয়া হয়। জেলার মান্নান হুইসেল বাজিয়ে দেয়।

রাজবন্দীদের এই অধিকার আদায়ের সংগ্রামের অপরাধে গুলিবর্ষণ হয় খাপরা ওয়ার্ডে। দরজা বন্ধ করে বন্দুকধারী সিপাই জানালার শিকের মধ্য দিয়ে গুলি চালায়। গুলিতে গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে পড়ে যায় সাতজন রাজবন্দী। সঙ্গে তেষট্টি বছরের কম্পরাম সিং। দিনাজপুরের কৃষক সংগ্রামের বীর সেনানী। মৃত্যুর আগে আহত কমরেডদের উদ্দেশে বলেন, 'যাঁরা বেঁচে থাকবে তাদের বলো—লাল ঝান্ডার সম্মান রেখেই আমরা মারা গেলাম।'

এবারের ঘটনা আর বিমূঢ় করে না মুনীরকে। যেন এটাই সত্য, এটাই অবধারিত। যেন সবটাই পরিকল্পনামাফিক ঘটছে। এমনটি করবে বলেই ভেবে রেখেছিলো তারা। নির্যাতন আর দমননীতির জোয়ারে ভাসিয়ে দেবে জনগণের সব অধিকার। মুনীরের বার বার মনে হয় কোনো কিছুই বিচ্ছিন্ন নয়, সবই একই সুতোয় গাঁথা। তাই প্রয়োজন শক্তিশালী আন্দোলন। তাই এখন আর মন খারাপ হয় না, হয় ক্রোধ, জন্মায় আক্রোশ।

এরমধ্যে মফস্বলের পাট চুকলো। ঢাকায় জগন্নাথ কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করলো। রাজনীতি থেকে দূরে সরে যাবার কারণে বাবার সঙ্গে এখন সম্পর্ক ভালো। অজিত গুহ খুশি যে মুনীর ঢাকায় এসেছে।

তুমি ঢাকায় এলে আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে প্রাণ আসবে। প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ আবার জোরদার করো।

মুনীর হাসে।

তুমি ছিলে না, শহরটা আমার কাছে ম্রিয়মান মনে হচ্ছিলো।

আপনি আমাকে বেশি ভালোবাসেন।

ভালোবাসা, ভালোবাসা! এ পাওয়ার যোগ্যতা সবার থাকে না মুনীর। সেটা অর্জন করতে হয়।

মানি।

মুনীর হেসে মাথা নাড়ে। কলেজ থেকে ধানমণ্ডি পর্যন্ত ফেরার পথে দু'পাশের দোকানপাট, রাস্তার মানুষ যানবাহন সব চোখের সামনে একাকার হয়ে যায়। মনে হয় সবটাই এই ভূখণ্ডের শস্যভূমি। এই মাটির ভিন্ন রঙ আছে। অন্য সব জায়গা থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্য-মণ্ডিত। ছোটখাটো কালো মানুষগুলো কয়লার আগুন। সারাক্ষণই ধিকিধিকি জ্বলে। এখানে শাসকগোষ্ঠী টিকতে পারেনি। ইতিহাস সাক্ষী বারবার এ মাটি উপড়ে ফেলেছে শাসন শোষণের শিকড়। এখন যারা হাত বাড়াচ্ছে তাদের পায়ের নিচে মাটি নেই। এই মাটি ভিন-দেশীর অনুপ্রবেশ রুখবে।

আবার দাঙ্গা। পঞ্চাশের ঢাকা দাঙ্গায় মেতে ওঠে। দাউ দাউ জ্বলে আগুনের শিখা। পুড়ে যায় ঘর, দোকান, বস্তি। নিভে যায় জীবন, স্রোত বয় রক্তের। হিন্দু এবং মুসলমান, শুধু ধর্ম ভিন্ন, মানুষ এক। কিন্তু কারো কাছে কেউ ক্ষমা পায় না। যারা ক্ষমা করে তারা অসহায়, নিরুপায় দর্শকমাত্র। বাকিরা উন্মত্ত উন্মাদনায় বিবেকশূন্য। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে সভাপতি করে দাঙ্গা প্রতিরোধের জন্য শান্তি কমিটি গঠিত হয়। শান্তি কমিটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সভা করে। সভাপতি ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন। বক্তারা যখন দাঙ্গার বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তখন একদল ছাত্র সভায় আক্রমণ চালায়। হাসান হাফিজুর রহমান প্রথমে শ্লোগান দেয়ার টিনের চোঙ নিয়ে তাদেরকে পাল্টা আক্রমণ করে। দু'একজনকে সে চোঙ দিয়ে মারতে থাকে। পরে অনেকে তার সঙ্গে জুটে গেলে 'নিখিল পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম লীগ'-এর ছাত্ররা সুবিধা করতে পারে না। আক্রমণ প্রতিহত করা হয়, গুণ্ডারা পালিয়ে বাঁচে।

হাসান ছোটখাটো মানুষ, তার ওপর কবি। তার সাহস দেখে সবাই বিস্মিত হয়। পরিস্থিতি শান্ত হলে সভা আবার শুরু হয়। সেদিন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তীব্র তীক্ষ্ম ভাষায় বক্তৃতা করেন। ছোটখাটো মানুষটির চুল বাতাসে ওড়ে, আবেগে প্রকম্পিত হয় কণ্ঠ। সে কণ্ঠ মানুষের শুভবুদ্ধি উদ্রেকের বাণী নিয়ে ছড়িয়ে যায় শহরে, লোকালয়ে, গ্রামে-গঞ্জে। কোথাও ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে, কোথাও

হৃদয় স্পর্শ করে। ক্ষণকালের জন্যে মানুষ নিজের জড়বুদ্ধি খোলার চেষ্টা করে। পঞ্চাশের পূর্ব বাংলা অত্যাচারে, নির্যাতনে, খুনে, হত্যায়, দাঙ্গায় চিহ্নিত হয়ে থাকে।

আটচল্লিশের ১১ মার্চ স্মরণে রাষ্ট্রভাষা দিবস পালন করার জন্যে উদ্যোগ গ্রহণ করে 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি'। কমিটির আহ্বায়ক আবদুল মতিন। সাতচল্লিশ, আটচল্লিশ, উনপঞ্চাশ, পঞ্চাশ কেমন লাফিয়ে লাফিয়ে বছরগুলো পেরিয়ে যায়। এই বছরই মুনীর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে যোগদান করে। সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েনের শূন্য পদে অস্থায়ী নিয়োগ। নীলক্ষেতে রেললাইনের কাছাকাছি একটি বাংলোতে সংসার পাতলো, নিরাভরণ ছিমছাম সংসার। কাজের সময় খুব দ্রুত যায় কি? সময় এখন ঘাড়ের বোঝা নয়, পংখীরাজ, দ্রুতবেগে ছুটছে। যেন গন্তব্য নির্ধারিত; পৌঁছে দেয়াই কাজ। মুনীর কখনো বারান্দায় দাঁড়িয়ে নির্মেঘ আকাশ দেখে। চারদিক বড় বেশি সবুজ, বুক ভরে যায়। শিক্ষকতায় অখণ্ড মনোযোগ, যেন একটি নিজস্ব পছন্দের আবাস। পাঠে নিমগ্ন হলে কেমন করে যে সময় কেটে যায় টের পায়না। ইদানিং শ'র নাটক টানে বেশি, অনুবাদের কথা ভাবছে। তার আগে 'নষ্টছেলে' নাটকটা লিখে শেষ করতে হবে। আর কিছুটা লিখলেই শেষ হয়ে যাবে। নাটকের পটভূমি পঞ্চাশের রাজনৈতিক আবহ। স্বাধীনতা পেয়েছে কিন্তু বাঁচার অধিকার পায়নি বলে এই নাটকের পাত্রপাত্রীরা সংগ্রাম করছে। লিখতে লিখতে কখনো আনমনা হয়ে যায়। এই নাটক কি নিজের পরিবারের প্রতিচ্ছবি? পলাতক রাজনৈতিক কর্মীকে কেন্দ্র করেইতো একাংকিকাটি রচিত হচ্ছে। যাকগে শেষ করে ফেললেই হয়। কত জল গড়ালো, সামনে আরো জল গড়াবে। কোনোকিছুর কি শেষ আছে? লিলি মা হবে। ওদের জীবনে প্রথম সন্তানের আগমন ধ্বনিত হয়েছে। হঠাৎ করেই মন অন্যরকম হয়ে যায়। কি এক উত্তেজনা রক্তে প্রবাহিত হয়। শুনতে পায় ঘণ্টাধ্বনি বাজছে। কিসের? বুঝতে পারে না। বোঝা যায় না। দ্রুতপায়ে লিলির কাছে এসে দাঁড়ায়। লিলি অবাক হয়।

কি হয়েছে?

কিছু না।

কি ভাবছো? কি হয়েছে?

কিছু না।

তোমাকে অন্যরকম দেখাচ্ছে।

নিজের সঙ্গেইতো মানুষের সবচেয়ে বড় খেলা লিলি। সেজন্যই বারবার পাল্টায়। পাল্টাতে পাল্টাতে বয়স্ক হয়, অভিজ্ঞ হয়।

তোমার বোধহয় কিছু হয়েছে ?

না কিছু হয় নি।

আবার পড়ার টেবিলে ফিরে আসে। নিজের মধ্যে আত্মস্থ হয়ে যায়। গালে হাত দিয়ে বসে থাকে। সামনে 'নষ্টছেলে'-র পাণ্ডুলিপি।

গত বছরের মতো একান্নতেও ১১ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রভাষা দিবস পালন করা হয়। মুন্নীরের মনে হয় সাতচল্লিশের পর থেকে কেবলই ঝড়ো দিনের সংগ্রাম। মনে পড়ে আটচল্লিশের ১১ মার্চের সংগ্রাম, ১৫ মার্চের চুক্তিপত্র ও খাজা নাজিমুদ্দিনের বিশ্বাসঘাতকতা। মনে পড়ে লিয়াকত রিপোর্ট, ফজলুর রহমানের ভাষা সংস্কার প্রচেষ্টা। পাশাপাশিভাবে শুধু দমননীতি আর নির্যাতন। পূর্ব বাংলার মানুষের জন্যে কোনো দরদ নেই, ভালোবাসাতো দূরের ব্যাপার। বড় বেশি একপেশে ঘটনা ঘটছে ওদের জীবনে। এখন আবার শুরু হয়েছে দুর্ভিক্ষের পদচারণা। লবণের সের ষোল টাকা। বিপন্ন সাধারণ মানুষ। পদদলিত তার পাকস্থলী, পদদলিত তার হৃদয়বৃত্তি। বছর গড়িয়ে এলো ২৬ জানুয়ারি, ১৯৫২। ঢাকায় নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগের অধিবেশন। সভাপতির ভাষণে খাজা নাজিমুদ্দিন ঘোষণা করলেন, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।

১০

চারদিনের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা আন্দোলন সংগঠন করে, পুরোনো সংগ্রাম পরিষদকে সক্রিয় করে তোলে এবং ব্যাপক ভিত্তিতে সংগ্রাম পরিষদ গঠনের জন্য সর্বদলীয় সম্মেলন আহবান করে। ৩০ জানুয়ারি ছাত্ররা ক্লাশে যোগদান করে না। বিকেলে ডিস্ট্রিক্ট বার লাইব্রেরী হলে আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে সর্বদলীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আন্দোলন পরিচালনার জন্য সভায় একটি কমিটি গঠিত হয়। কাজী গোলাম মাহবুব কমিটির আহবায়ক। কমিটি প্রথম সভাতেই সিদ্ধান্ত নেয় যে সভা, শোভাযাত্রা ও হরতালের মাধ্যমে সারা দেশে ২১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা দিবস পালন করা হবে।

এই দিবসের কর্মসূচী সাফল্যজনকভাবে বাস্তবায়নের জন্যে সংগ্রাম পরিষদ ৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকা শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ধর্মঘট

পালন, শোভাযাত্রা ও ছাত্রজনতার মিলিত সভা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেয়। ১২ ও ১৩ তারিখ হবে পতাকা দিবস। সেদিন আন্দোলন পরিচালনার জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হবে। মুনীরের বারবারই মনে হয় আটচল্লিশের পরিস্থিতি এখন আর নেই। বদলে গেছে আন্দোলনের চরিত্র। এখনকার সংগ্রাম ছাত্র-জনতার মিলিত সংগ্রাম। স্তিমিত হবার সম্ভাবনা নেই।

অজিত গুহ বলেন, এ এক অগ্নিপরীক্ষা। জয় পরাজয় নির্ধারণের দিন।

তারুণ্য পরাজিত হতে জানে না। ছাত্ররা যে দায়িত্ব নিয়েছে সেখান থেকে পিছু হটবে বলে আমি বিশ্বাস করি না।

মুনীর দৃঢ় কণ্ঠে বলে।

তোমার বিশ্বাস যেন সত্যি হয়।

নীলক্ষেতের রাস্তায় অজিত গুহ হেঁটে যান। আলো আঁধারী রাস্তা, তিনি জগন্নাথ হলে যাবেন, তাঁর বুকে ব্যাকুলতা। মুনীর নিজের ঘরে ফিরে আসে। ট্রেন যাচ্ছে বিকট শব্দে। ঘটাং ঘটাং শব্দ শুনলেই মনে হয় যেন কিছু কেটে যাচ্ছে। কি কাটছে ঐ ধাবমান যন্ত্র ? সময়ের নাড়ি কি ? ঘরে তার প্রথম সন্তান তারস্বরে চেঁচায়। বারান্দায় দাঁড়িয়ে সে শব্দ শোনে। মা তাকে থামানোর চেষ্টা করছে, তবু সে কাঁদছে। মুনীরের মনে হয় তার বুকে ঐ রকম কান্নাময় ধ্বনি আছে। পারি-পার্শ্বিকের হাজারো উপাদান তা থামানোর চেষ্টা করছে। তবু থামেনা, থামতেই চায়না।

৪ তারিখের ছাত্র-জনতার মিলিত সভায় বক্তৃতা করেন মওলানা ভাসানী। বক্তারা লীগ সরকারের বিশ্বাসঘাতকতার তীব্র নিন্দা করে। বাংলা ভাষার দাবি প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালাবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। শান্তিপূর্ণভাবে সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১২ ও ১৩ তারিখ পতাকা দিবসও পালিত হয় নিরুপদ্রবে। পুলিশ কোনো হস্তক্ষেপ করে না। প্রতিটি সভা, মিছিলে স্রোতের মতো লোক এসে জমায়েত হয়। সরকারের উৎপীড়নমূলক নীতি, দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ মানুষের দৃষ্টি খুলে দিয়েছে। এখন ভাষার প্রশ্নে এই জঘণ্য ষড়যন্ত্র মানুষকে আর দাবিয়ে রাখতে পারছেনা। কোনো কিছুর ধুয়া তুলে পূর্ব বাংলার মানুষকে আফিম খাইয়ে রাখা যাচ্ছেনা। ১৩ তারিখে পাকিস্তান অবজারভারের প্রকাশনা বন্ধ করে দিয়ে সম্পাদক আবদুস সালামকে গ্রেফতার করা হয়। অবস্থার যত অবনতি হচ্ছে মানুষের অসন্তোষ তত ধূমায়িত হচ্ছে। ২১ তারিখে একদিকে জনসাধারণের ধর্মঘটের প্রস্তুতি অন্যদিকে ঐ দিন পূর্ববঙ্গ সরকারের বাজেট অধিবেশন। সরকার ২০ তারিখ রাত্রি থেকে

ক্রমাগত এক মাসের জন্যে ঢাকা জেলার সর্বত্র ধর্মঘট, সভা, মিছিল নিষিদ্ধ করে ১৪৪ ধারা জারি করলো। সঙ্গে সঙ্গে থমথমে হয়ে গেলো শহরের আবহাওয়া।

পরদিন বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে গাজীউল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রচণ্ড বাক-বিতণ্ডার মধ্য দিয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে ১৪৪ ধারা ভাঙা হবে। ছাত্ররা দশজন করে মিছিল নিয়ে বেরোতে লাগলো। গেটের বাইরে ছিলো আই, বি, আর পুলিশ। ছাত্রদের প্রথম দশজনী মিছিল বের হতেই পুলিশ গ্রেফতার করে ট্রাকে তুললো। আবার বেরুলে আবার তুললো। এভাবে ট্রাক ভর্তি হলে লালবাগ থানায় নিয়ে গেলো। কিন্তু এত গ্রেফতারের পরও ছাত্রদের দমন করতে না পেরে পুলিশ কাঁদুনে গ্যাস ছুঁড়লো। মুনীর তাঁর সাইকেল নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ঢোকার চেষ্টা করছিলো। রশিদ বিল্ডিংয়ের সামনে পুলিশ তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলো।

বাস্টার্ড।

দাঁত কিড়মিড় করে সাইকেলটা তুলে নিয়ে ঢুকলো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে। নাদেরাকে খুঁজলো এদিক ওদিক। প্রায় শ' পাঁচেক পোস্টার লেখার দায়িত্ব ছিলো ওর ওপর। গত রাতেও অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করেছে। ও কি গ্রেফতারী বরণ করেছে, না কি এখনো ভেতরে ? গত-কাল 'রাজবন্দী মুক্তি আন্দোলন' কমিটির সভায় নাদেরা চমৎকার বক্তৃতা করেছিলো। শেখ মুজিবুর রহমান ও মহিউদ্দীন আহমদসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবি করেছে কমিটি। কাছাকাছি কোথাও নাদেরাকে খুঁজে পায়না মুনীর।

পুরো এলাকা ততক্ষণে রণাঙ্গনে পরিণত হয়েছে। ছাত্ররা যতই শ্লোগান দেয় আর মিছিলে এগিয়ে যায় ততই পুলিশ তাদের ওপর বেপ-রোয়া আক্রমন চালায়। লাঠিচার্জের ফলে অনেক ছাত্র আহত হয়। মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল, মেডিক্যাল কলেজ গেট, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হোস্টেল ও তার চারদিকে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। বেলা তিনটা থেকে প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন। বাইরে সদস্যদের কাছে ছাত্ররা পুলিশের জুলুমের প্রতিবাদ জানায়। এক সময় ছাত্রদের তাড়া করতে করতে পুলিশ মেডিক্যাল হোস্টেল প্রাঙ্গণে ঢুকে আক্রমণ চালালে ছাত্ররা ইটের টুকরো ছুঁড়তে থাকে। এক পর্যায়ে পুলিশ গুলি বর্ষণ করে। ঘটনাস্থলে শহীদ হয় আবদুল জব্বার ও রফিকউদ্দীন আহম্মদ। গুরু-তর আহত অবস্থায় বরকতকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে রাত আটটায়

বরকত মারা যায়। গুলি চালানোর খবর ছড়িয়ে পড়লে বদলে যায় শহরের মানচিত্র। হাজার হাজার মানুষ ছুটে আসে—হাজার হাজার মানুষ দৌড়ে আসে—হাজার হাজার মানুষ উড়তে উড়তে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে রণক্ষেত্রে। লক্ষ লক্ষ কণ্ঠ বজ্রকণ্ঠ হয়ে ছড়িয়ে পড়ে আকাশে বাতাসে—ভেসে ভেসে চলে যায় বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়ে নক্ষত্রে নীলিমায়। রাত্রির আকাশের দিকে তাকিয়ে মুনীর বসে থাকে বারান্দায়। সকালে পুলিশ ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলে হাতে ব্যথা পেয়েছিলো। এখন মনে হয় সে ব্যথা কোথাও নেই, ব্যথা শরীর জুড়ে—ব্যথা ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে। যাদের পড়ানোর জন্যে রাজনীতি ছেড়ে শিক্ষকতায় এলো সেই প্রিয় ছাত্র এখন রাজপথে গুলিবিদ্ধ, রক্তাক্ত শহীদ। যে ভাষা আন্দোলনের প্রথম বক্তা ও নিজে, তার উত্তরসূরী হয়ে প্রিয় ছাত্ররা এখন তুমুল সংগ্রামে রত, জীবনের বিনিময়ে মরণপণ সংগ্রাম। তখন ঘৃণায় উদ্দীপ্ত হয় হৃদয়। ক্রোধ জন্মায় প্রতি রোমকূপে, যেন তারুণ্য ফিরে আসছে রক্তের লোহিতকণিকায়। এই জঘন্যতম অন্যায়ের প্রতিবাদ না করলে ক্ষমা নেই উত্তরসূরীদের কাছে, জীবন অবরুদ্ধ হয়ে থাকবে বিবেকের গ্লানি হয়ে। এবার প্রতিবাদী কণ্ঠ মুনীর ছাত্র নয়, এবার শিক্ষক মুনীর। এবার রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে নয়, এবার লক্ষ ছাত্রের দার্শনিক পিতা হয়ে। এবার দেশের সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতার সঙ্গে সংযুক্ত আবহমান বাংলার বাঙালি হয়ে।

২২ তারিখে গুলি বর্ষণের বিরুদ্ধে শিক্ষকদের প্রতিবাদ সভায় সোচ্চার হয়ে ওঠে মুনীরের কণ্ঠ। যেন জীবনের শ্রেষ্ঠ বক্তৃতাটি দেবার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করেছে। ভাঙা ভাঙা কণ্ঠস্বর তার, কিন্তু বক্তৃতার শব্দমালা অলঙ্কার হয়ে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। ক্রোধে, ঘৃণায়, বেদনায়, যন্ত্রণায় কণ্ঠের ওঠানামা এক আশ্চর্য সংবেদনশীলতায় মুহু-মুর্হু শ্রোতার হৃদয়ে প্রবেশ করছে। যেন একজন মানুষ ঠোঁট নেড়ে কথা বলছেনা, বলছে তার সমস্ত শরীর। এমন মৌলিক এবং নিজস্ব বাচন ভঙ্গিতে মুনীর মুগ্ধ শ্রোতার সামনে এক কিংবদন্তী পুরুষ। সে যতক্ষণ বলে ততক্ষণ তার মাথা আকাশ ছুঁয়ে থাকে।

প্রাণভরে বক্তৃতা দেবার খেসারত দিতে হলো ২৬ তারিখে জন-নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার হয়ে। একুশ থেকে ছাব্বিশ মাত্র ক'টা দিন কিন্তু উত্তাল সমুদ্রের চাইতেও ভয়ঙ্কর এই ক'টা দিনের পরিধি। বাইশ তারিখে ব্যাপকতম ধর্মঘটের চাপে লীগ সরকার বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার এবং তারজন্যে গণপরিষদের কাছে সুপারিশ করার

প্রস্তাব গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। তেইশ তারিখে মেডিক্যাল হোস্টেলের গেটের পাশে ছাত্ররা নিজেরাই শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ গড়ে তোলে। হাতে হাতে ইট আসে, নীরবে কাজ হয়, গড়ে ওঠে স্মৃতির যন্ত্রণা। চারদিকে অখণ্ড নীরবতা, যেন কথা বললে কারো ঘুম ভেঙে যাবে। সরকারের দমননীতি প্রবল হয়ে ওঠে। চব্বিশ তারিখে পরিষদ অধিবেশন মুলতবী ঘোষণা করা হয়। পুলিশ ছাত্রাবাসে হামলা চালায়, অসংখ্য ছাত্র গ্রেফতার বরণ করে। শহীদ মিনার ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেলা হয়। মুনীরের মনে হয় শান্ত, স্নিগ্ধ, সবুজ ঢাকা নিমেষে গা ঝাড়া দিয়ে উঠেছে। এর অমিত শক্তি এখন প্রতিটি মানুষের ধমনীতে বহমান। ওরা কয়জনকে রুখবে? যারা প্রাণ দিতে পারে তারা কি পিছু হটতে জানে? জেল গেটে দাঁড়িয়ে ওর চোখের সামনে ভাষণের মুখ ভেসে ওঠে, ওর প্রথম সন্তান, মাত্র কয়েক মাসের শিশু, এখনো বাবা চিনেনি। মুহূর্তে ম্লান হয়ে যায় দৃষ্টি।

অজিত গুহ বলেন, কি ভাবছো?

ভাষণের কথা।

ও ভালোই থাকবে। ওর জন্যে ভেবোনা।

মুনীর কথা বলে না। তখন প্রবেশ করছে ভেতরে। পৃথ্বীশ চক্রবর্তী, মোজাফফর আহমদ চৌধুরী, অজিত গুহ সবাই রাজবন্দী হয়ে।

আমার ইচ্ছে করছে চিৎকার করে শ্লোগান দিতে।

অজিত গুহ থমকে দাঁড়িয়ে বলে।

তখনই পেছন থেকে গুঁতো খায়। কটমট করে পুলিশের দিকে তাকিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করে। মুনীর বলে, জেলের সময়টা আমরা অপচয় করবোনা। প্রতিটি মুহূর্ত আমাদের জন্যে অত্যন্ত মূল্যবান।

ওদের পেছনে বাইরের পৃথিবী বন্ধ, লোহার গেটের আড়ালে ঢাকা পড়েছে।

সামনে অনাগত ভবিষ্যৎ, বন্দী-সময় কেড়ে নেয় চরম মূল্য।

১১

আবার একুশে, এবার তেপ্পান্ন। দেখতে দেখতে বছর গড়িয়েছে। ঢাকা জেলের দেওয়ানি নামের ছোট ঘরটিতে দিন কাটে মুনীরের। অজিত গুহ তাকে প্রাচীন আর মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য পড়তে সাহায্য করছে। ও সিদ্ধান্ত নিয়েছে জেলে থেকেই বাংলায় এম. এ. দেবে।

দিনভর পাঠে নিমগ্ন সময়, রাতে ঘুম, কখনো তারা গোনা, স্মৃতি রোমন্থন। কখনো বেদনা, কখনো উদ্দীপনা। মোটামুটি অনুকূল স্রোতেই পেরিয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে বিশ্ববিদ্যালয়ের চিঠি আসে চাকুরি সংক্রান্ত, লাইব্রেরির বই, বাসার বৈদ্যুতিক-সংযোগের জন্যে পাওনা পরিশোধ, বাসা ছেড়ে দেয়ার নোটিশ ইত্যাদি। এখন আর এইসব নিয়ে মাথা ঘামায় না, মন খারাপ করারও কিছু নেই। বরং তেপান্নর একুশে নতুন প্রেরণায় উজ্জীবিত করে। তেপান্নর একুশে উদ্‌যাপন উপলক্ষে ঢাকা জেলের দু'নম্বর খাঁচার বন্দী কমিউনিস্টরা নাটক অভিনয় করার উদ্যোগ নেয়। রণেশের কাছ থেকে গোপন চিঠি আসে মুনীরের কাছে। নাটক লিখতে হবে, হঠাৎ করে বুকটা খালি হয়ে যায় ওর। অনেকক্ষণ রণেশের চিরকুটের ওপর থেকে চোখ ওঠাতে পারে না। ক'টি মাত্র কথা, কিন্তু কি তার শক্তি। কি তার তেজ! শরীরের প্রতি রোমকূপ দাঁড়িয়ে যায়। যেন মহাকালের আহ্বান, মুনীর এখনই সময়, উঠে দাঁড়াও, চেতনাকে শানিত করো, স্মৃতি অমর করে রাখো। পেন্সিলে লিখেছে রণেশ, মুনীর একুশকে অমর করে রাখতে হবে। একুশকে কেন্দ্র করেই আমাদের সংগ্রাম শুরু হবে। তেপান্নর যাত্রা শুরুতে তোমার লেখা নাটক আমরা মঞ্চায়ন করতে চাই। আমাদের জন্যে নাটক লিখে ফেলো।

শব্দটা মুনীর বারবার আওড়ায় যাত্রা শুরু, যাত্রা শুরু। মাথায় প্রবল চাপ। উত্তেজনা, উদ্দীপনা, সৃষ্টির বেদনা ইত্যাদি সমস্ত অনুভূতি এক হয়ে সবটা কেমন সমান্তরাল হয়ে আছে। হ্যাঁ, নাটক লিখতে হবে। জেলে অভিনয় করা যায় এমনভাবেই পটভূমি তৈরি করতে হবে। বাহান্নোর ঘটনা নিয়েই তো লিখতে পারি? ও গরাদের শিখে মাথা ঠেকিয়ে ভাবতে থাকে। তখন সন্ধ্যা। মগরেবের আজান ভেসে আসছে। হঠাৎ করে সমস্ত শরীর জুড়ে কাঁপন জাগে। মনে হয় এ যেন মুয়াজ্জিনের কণ্ঠ নয়, এ কণ্ঠ ঈমাম সাহেবের। বাহান্নোর বাইশে ফেব্রুয়ারিতে যিনি গায়েবানা জানাজায় মোনাজাত করেছিলেন। বলেছিলেন, "হে আল্লাহ, আমাদের অতিপ্রিয় শহীদানের আত্মা যেন চির শান্তি পায়। আর যে জালিমরা আমাদের প্রাণের প্রিয় ছেলেদের খুন করেছে তারা যেন ধ্বংস হয়ে যায় তোমার দেয়া এই দুনিয়ার বুক থেকে।" আজান শেষ হয়ে গেলেও ঈমাম সাহেবের কণ্ঠের রেশ ফুরোয়না। মুনীরের বারবার মনে হয় সেই কণ্ঠ বাইশ তারিখে মেডিক্যাল হোস্টেলের সামনে বাঁশের মাথায় গাঁথা শহীদের রক্তাক্ত জামার মতো পত্‌পত উড়ছে। কণ্ঠস্বরের রঙ হয়না, তবু মুনীরের মনে হয় ঐ কণ্ঠ লাল, ঐ কণ্ঠের রঙ আছে।

ঠিক এমনি অনুভূতি হয়েছিলো ওর পঞ্চাশের দাঙ্গার সময় ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর দাঙ্গা বিরোধী বক্তৃতা শুনে। ছোটোখাটো মানুষটি টেবিলের ওপর দাঁড়িয়ে নিজের সর্বশক্তি দিয়ে তীক্ষ্ণধী ভাষায় বক্তৃতা করছিলেন। সেদিন রোমাঞ্চিত হয়েছিলো মুনীরের শরীর। একটা লাইন এখনো মনে আছে "আমি কোরান হাদিস পড়েছি, আমি চ্যালেঞ্জ করছি কেউ যদি কোরান কিংবা হাদিস থেকে দেখাতে পারে যে নিরীহ এবং নিরস্ত্র হিন্দুদেরকে হত্যা করা পুণ্যের কাজ তবে আমি তার দাসত্ব স্বীকার করবো," সেদিনও মুনীরের মনে হয়েছিলো ঐ কন্ঠের রঙ আছে, ঐ কন্ঠের রঙ লাল। শব্দের মধ্যে অনাবশ্যক চন্দ্রবিন্দু প্রয়োগ করে নাকি সুরে যে বক্তৃতা তিনি করেছিলেন সে বক্তৃতায় প্রকম্পিত হয়েছিলো আকাশ-বাতাস। ঠিক ঈমাম সাহেবের কণ্ঠের মতো। গরাদে গাল ঠেকালে শীতল স্পর্শ ওকে ভিন্ন মানুষ করে দেয়। কেবলই মনে হয় জুলুমে, অত্যাচারে, নির্যাতনে ভিন্ন আদর্শের মানুষ এভাবে একই সমান্তরালে এসে দাঁড়ায়। তখন তাঁদের বুকের কোন্দর সাগরের মোহনা হয়ে ওঠে, সব নদী সেখানে এসে মিলিত হলে যে সমুদ্রের মতো তাকে বুকে ধারণ করে।

মুনীর পায়চারি করে। কিছুতেই আবেগ সংহত হয়না। কি লিখবে, কত কথা লিখবে ? কেমন করে নাটক তৈরি হবে ? মনে পড়ে গাজীউল হকের বক্তৃতা, একুশ তারিখে সেদিন সে ছিলো উত্তেজিত, আবেগাক্রান্ত। বলেছিলো, "১৪৪ ধারা ভাঙলে নাকি গুলি করা হবে—ছাত্রদের গুলি করে হত্যা করা হবে। আমরা নুরুল আমীন সরকারের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করছি। ১৪৪ ধারা আমরা ভাঙবো। আমরা দেখতে চাই জনাব নুরুল আমীন সরকারের বারুদাগারে কত বুলেট জমা আছে।" মনে পড়ে প্রথম দশজনী মিছিলের নেতৃত্ব দিচ্ছে হাবিবুর রহমান শেলী, নেতৃত্ব দিচ্ছে আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ্। ওরা বেরুলেই পুলিশ গ্রেফতার করে তুলে নিচ্ছে ট্রাকে। ছবিগুলো বড় বেশি স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ। এত বেশি কাছের যে আত্মস্থ করা যায় না। এসব নিয়ে লেখা যাবেনা। কেবলই বুকের মধ্যে দারুণ মিছিল গর্জে উঠছে। অন্য বিষয় চাই, যেটা নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে শিল্প হয়ে উঠবে।

রাতের খাওয়া হয়ে গেছে। মাথার মধ্যে এখনো ধোঁয়াটে কুণ্ডলি, জট পাকাচ্ছে ঘটনা। জেলের ঘণ্টায় এগারোটা বাজলো। ঢং-ঢং শব্দটা অন্যরকম হয়ে যায়, যেন গুলি বর্ষণের প্রতিবাদে মেডিক্যাল কলেজের হোস্টেল থেকে বক্তৃতা করছে শহীদুল্লা কায়সার। সেই কণ্ঠ যেন

ঐ ঢং-ঢং শব্দের মতো বুকের ভেতর হাতুড়ি পেটায়। ভেসে ওঠে হাসান হাফিজুর রহমানের মুখ। সবার মাঝে লিফলেট বিলি করছে। অল্প-ক্ষণের মধ্যে নিজ উদ্যোগে, আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় ছাপিয়ে এনেছে লিফলেট। বিলি হচ্ছে শত শত লিফলেট। মুনীর দেখতে পায় হালকা মেঘের মতো উড়ে উড়ে হাজার হাজার লিফলেট ছড়িয়ে যাচ্ছে শহরে-বন্দরে, গ্রামে-গঞ্জে, মাঠে-ঘাটে, প্রান্তরে। ছেয়ে যাচ্ছে সবুজ পত্রালি, ভরে উঠেছে শস্যময় ভূমি, নদীর তলদেশ। ছুটে আসছে মানুষ—মানুষ। না, এসব দিয়ে নাটক হবেনা। সবই বড় বেশি বুকের কাছাকাছি। তখুনি মনে হয় শহীদদের কথা, যাদের সঙ্গে এখন মুনীরের ব্যবধান অনেক। যারা ইতিহাসে অমর হয়েছে, সেই কালজয়ী নক্ষত্র বুকের নিচে জ্বলজ্বল করে ওঠে। কাগজ টেনে লিখতে বসে ও।

[মঞ্চে কোনোরূপ উজ্জ্বল আলো ব্যবহৃত হবে না। হারিকেন, প্রদীপ ও দিয়াশলাইয়ের কারসাজিতে নাটকের প্রয়োজনীয় ভয়াবহ, রহস্যময় অশরীরী পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে]

দৃশ্য ঃ গোরস্থান। সময় ঃ শেষরাত্রি।

মগ্ন হয়ে লিখতে থাকে মুনীর। একটানা অনেকটা লেখার পর কলম থেমে যায়। মুনীর ঘাড় সোজা করে মাথা ঝাঁকিয়ে নেয়। রাত কত বুঝতে পারে না। বারোটার ঘণ্টা শুনেছিলো তারপর আর কিছু মনে নেই। কাগজগুলো বালিশের নিচে রেখে ঘুমুতে যায়, ঘুম আসে না, চোখে তৃষ্ণা। রাত ফুরোয়।

সারাটা সকাল ইতস্তত পায়চারি করে। বসি বসি করেও লিখতে বসা হয় নি। কেবলই ভাবছে। দুপুরে খাবারের পর কলম আবার সচল হয়ে ওঠে। অজিত গুহ তাগাদা দিয়েছেন। নাটকের বিষয়টি তাঁরও ভীষণ পছন্দ হয়েছে। জেলে অভিনীত হবে বলে নারী চরিত্র নেই। যেটুকু লেখা হয়েছে ঐটুকু পড়ে অজিত গুহ বলেছেন, চমৎকার আঁটসাঁট বাঁধুনি। মুনীরের খুঁতখুঁতি কমেনা। একটু লিখে আবার উঠে পড়ে। সিগারেট খায়, পানি খায়, পায়চারি করে, সময় ফুরিয়ে যায়। রণেশ আর একটা চিরকুট লিখে পাঠিয়েছে, কি করলে জানাও। অধীর অপেক্ষায় আছি আমরা।

নিজের ওপর রাগ বাড়ে, চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করে। হাতে যদি আলাদীনের যাদুর প্রদীপ থাকতো ? একথা শুনলে অজিত গুহ ক্ষেপে

ওঠেন। বলেন, সৃষ্টিশীল লেখকরা আলাদীনের যাদুর চেরাগের চাইতে ক্ষমতাবান, তোমার ক্ষমতা তুমি বুঝতে পারোনা, বুঝতে পারে পাঠক, বোঝে জাতি। তুমি যা রেখে যাবে তার সবটাই জাতির সম্পদ। আলাদীনের আজ্ঞাবাহী দৈত্য জাতির জন্যে কিছু করতে পারেনি। কখনো অজিত গুহের কথা বিশাল বট বৃক্ষের মতো ছায়া দেয়, স্নিগ্ধ করে অশান্ত স্নায়ু। যেন একজন পিতা মাথার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, আর কোনো ভয় নেই। মুনীর আবার লিখতে বসে। লেখা এখন স্বচ্ছন্দে আসছে, বেগবান ঝর্ণার মতো পাথর খণ্ড ডিঙিয়ে।

নেতা। কে ?

হাফিজ। সেই লাশটা।

নেতা। লাশ ? কোন লাশটা ?

হাফিজ। বুলেট খাওয়া। ছাত্র। খুলি নাই।

নেতা। ওহ্ ! কি চায় ?

হাফিজ। চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। জিজ্ঞেস করে দেখব ?

নেতা। কি জিজ্ঞেস করবে ?

হাফিজ। এই, কি চায়—কেন উঠে এসেছে, ঠাণ্ডা লাগছে নাকি—এইসব ?

নেতা। আমাদের কথা বুঝবে ?

হাফিজ। ট্রাই করতে হবে। সব লাইনেই ট্রাই করতে হবে। এটা একটা নতুন সিচুয়েশন স্যার। কুললি অগ্রসর হতে হবে। ঘটনা হিসেবে এটা অবাস্তব হতে বাধ্য। কিন্তু অন্যরকম হলেও আমাদের ভয় পেলে চলবে না। ফেইস করতেই হবে।

[উঠিয়া দাঁড়াইবে। বেশ কষ্ট। নাটুকে মাতালের টলায়মান অবস্থা নয়, তবে নেশা যে উভয়েরই খুব গাঢ় হইয়াছে তাহা স্পষ্ট।]

নেতা। আপনি কিছু ভয় পাবেন না। আমি পেছনে রয়েছি। পিস্তলের টিপ আমার পাক্কা।

হাফিজ। খবরদার অমন কাজও করবেন না। (ফিস ফিস করিয়া) পিস্তলের কেস এটা নয় স্যার! বুঝতে পারছেন না—এটা ঠিক মানে, অন্য জিনিস, মানুষ নয়। পিস্তল রেখে দিন। লক্ষ্য করুন আমি কি রকম সামলে নিচ্ছি। একটু আলাপ করতে পারলেই পোষ মানিয়ে নেবো। (ধীরে

ধীরে আগাইয়া মূর্তির নিকট আসে। বাতাসে টানিয়া টানিয়া স্পর্শ করিতে চেষ্টা করে।) এই এই ! আমার কথা শুনতে পাচ্ছ ? এই ! হেই ! (মূর্তি নীরব নিশ্চল) (ঘুরিয়া) স্যার, কোন সাড়া দিচ্ছে না যে ?

নেতা। বোধহয় আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসেনি। আমাদের সঙ্গে হয়ত কোন কাজ নেই। ভালো। তা ভালো। ও থাকুক। আমরা চলো আমাদের কাজে যাই।

হাফিজ। তা হয় না স্যার। ওকে এখানে দাঁড় করিয়ে আমরা চলে যাবো ? তা হয় না স্যার। আমার ডিউটি আমাকে করতেই হবে। ওকে ফেরত না পাঠিয়ে আমরা চলে যেতে পারি না, স্যার।

মূর্তি। আমি যাবো না। আমি থাকবো।

(দুজনে হতবাক। ধীরে ধীরে হাফিজ আগাইয়া যায়)

হাফিজ। কোথায় যাবে না ? কোথায় থাকবে ?

মূর্তি। কবরে যাবো না। এখানে থাকবো।

হাফিজ। অবুঝের মতো কথা বলো না। তোমাদের এখন এখানে আর থাকতে নেই। তোমরা মরে গেছ। অন্যখানে তোমাদের জন্য নতুন জায়গা ঠিক হয়ে গেছে। সেখানেই এখন তোমাদের চলে যাওয়া উচিত।

মূর্তি। মিথ্যে কথা। আমরা মরিনি। আমরা মরতে চাইনি। আমরা মরবো না।

হাফিজ। (নেতার কাছে আসিয়া) বড় একগুঁয়ে স্যার। আলাপ করে সুবিধে হবে বলে মনে হচ্ছেনা। একটা বক্তৃতা দিয়ে দেখবেন স্যার ? যদি কিছু আছর হয়। পারবেন না স্যার ? আপনি তো বলেছিলেন—যাইহোক—বক্তৃতা দিতে আপনার কোন কষ্ট হবে না। একবার ট্রাই করুন না !

নেতা। (ভাল করিয়া শুনিয়া) দেখ ছেলে, আমার বয়স হয়েছে। তোমার মুরুব্বিরাও আমাকে মানে। বহুকাল থেকে এদেশের রাজনীতি আঙ্গুলে টিপে টিপে গড়েছি, শেপ দিয়েছি। কওমের বৃহৎ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের, বলতে পার, আমিই একছত্র মালিক ! কোটি কোটি লোক আমার হুকুমে উঠে বসে—

মূর্তি। কবরে যাবো না।

নেতা। আগে কথাটা ভাল করে শোন। তুমি বুদ্ধিমান ছেলে, শিক্ষিত ছেলে। চেষ্টা করলেই আমার কথা বুঝতে পারবে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সবচেয়ে উঁচু ক্লাসে উঠেছো। অনেক কেতাব পড়েছো। তোমার মাথা আছে।

মূর্তি। ছিল। এখন নেই। খুলিই নেই। উড়ে গেছে। ভেতরে যা ছিল রাস্তায় ছিটকে পড়ে নষ্ট হয়ে গেছে।

নেতা। জীবিত থাকতে তুমি দেশের আইন মানতে চাওনি। মরে গিয়ে তুমি এখন পরপারের কানুনকেও অবজ্ঞা করতে চাও। কম্যু-নিজমের প্রেতাত্মা তোমাকে ভর করেছে, তাই মরে গিয়েও এখন তুমি কবরে যেতে চাও না। তোমার মত ছেলেরা দেশের মরণ ডেকে আনবে। সকল সর্বনাশ না দেখে বুঝি কবরে গিয়েও শান্ত থাকতে পারছো না। তোমাকে দেশের নামে, কওমের নামে, দীনের নামে, যারা এখনও মরেনি—তাদের নামে মিনতি করছি—তুমি যাও, যাও, যাও।

মূর্তি। আমি বাঁচবো।

নেতা। কি লাভ তোমার বেঁচে? অশান্তি ডেকে আনা ছাড়া তোমার বেঁচে কি লাভ? তুমি বেঁচে থাকলে বারবার দেশে আগুন জ্বলে উঠবে। সব কিছু পুড়িয়ে ছারখার না করে সে আগুন নিভবে না। তার চেয়ে তুমি লক্ষ্মী ছেলের মত কবরে চলে যাও। দেখবে দু'দিনে সব শান্ত হয়ে যাবে। দেশে সুখ ফিরে আসবে। (মূর্তি মাথা নাড়ে) আমি ওয়াদা করছি তোমাদের দাবী অক্ষরে অক্ষরে আমরা মিটিয়ে দেবো। তোমার নামে মনুমেন্ট গড়ে দেবো। তোমার দাবি এ্যাসেম্বলীতে পাশ করিয়ে নেবো। দেশজোড়া তোমার জন্যে প্রচারের ব্যবস্থা করবো। যা বলবে তাই করবো। দোহাই তোমার তবু অমন স্তব্ধ পাথরের মূর্তির মত, আকাশ ছোঁয়া পাহাড়ের মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থেকো না। সরে যাও, চলে যাও, অদৃশ্য হয়ে যাও।

[সর্বাঙ্গে কাফনের কাপড় জড়াইয়া আর একটি মূর্তি নিঃশব্দে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। চুলে রক্ত মাখা। মুখে আঘাতের চিহ্ন। ঠোঁটের দুই পাশে বিশুষ্ক রক্ত রেখা]। কে? তুমি কে?

মূর্তি(২)। নাম বললে চিনতে পারবেন না। হাইকোর্টের কেরানী ছিলাম। তখন টের পাইনি। ফুসফুসের ভেতর দিয়ে চলে

গিয়েছিল। এপিঠ ওপিঠ। বোকা ডাক্তার খামাখা কেটেকুটে গুলিটা খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়েছে। জমাট রক্তের মধ্যে ফুটো নজরেই পড়েনি প্রথমে।

নেতা। তুমিও এই দলে এসে জুটেছো নাকি ?

মূর্তি (২)। গুলি দিয়ে গেঁথে দিয়েছেন। ইচ্ছে করলেও আলগা হতে পারবো না।

এখনো শেষ হয়নি নাটক, মুনীর লিখছে, আর অল্প বাকি। বাহান্নোর একুশের পটভূমিতে রচিত হচ্ছে নাটক। জেলখানার ঘণ্টা ঢং-ঢং করে জানিয়ে যায় সময়। থেমে থেমে ঘণ্টা বাজে। লেখা থামেনা, কলমে এখন যাদুর প্রদীপের ঘষা, একটা শিল্পিত দৈত্য বেরুচ্ছে।

রচিত হচ্ছে মুনীরের 'কবর'।